সংঘবদ্ধ হয়ে অনায়াসে এ কাজ সমাধা করে ফেলে। রাজকীয় রাগ ও গোসার লীলাখেলা এর চাইতে বেশীই হয়ে থাকে।

কিন্তু এই রাষ্ট্র আল্লাহ্‌র ও তাঁর রসূল (সা)-এর বনূ নুযায়েরের বিশ্বাসঘাতকতা যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যায়, তখনও তিনি তাদের গণহত্যার সংকল্প করেন নি। তাদের মাল ও আসবাবপত্র ছিনিয়ে নেওয়ার কোন পরিকল্পনা করা হয়নি; বরং তিনি---(১) সব আসবাবপত্র নিয়ে কেবল শহর খালি করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন; (২) এর জন্যও তাদেরকে দশ দিনের সময় দেন, যাতে অনায়াসে সব আসবাবপত্র সাথে নিয়ে অন্যত্র স্থানান্তরিত হতে পারে। বনূ নুযায়ের এরপরেও যখন ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করল, তখন জাতীয় পদক্ষেপ নেওয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়; তাই (৩) কিছু খর্জুর বৃক্ষ কাটা হয় এবং কিছু বৃক্ষে অগ্নি সংযোগ করা হয়, যাতে তারা প্রভাবান্বিত হয়। কিন্তু দুর্গে অগ্নি সংযোগ অথবা গণহত্যার নির্দেশ তখনও জারি করা হয়নি; (৪) অতঃপর তারা যখন বেগতিক হয়ে শহর ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল, তখন সামরিক অভিযান সত্ত্বেও এক ব্যক্তি এক উটের পিঠে যে পরিমাণ আসবাবপত্র নিয়ে যেতে পারে সে পরিমাণ আসবাবপত্র নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা তাদেরকে দেওয়া হল। ফলে তারা গৃহের কড়িকাঠ, তক্তা এবং দরজার কপাট পর্যন্ত উটের পিঠে তুলে নিল; (৫) তারা সব আসবাবপত্র সাথে নিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু কোন মুসলমান তাদের প্রতি বক্র দৃষ্টিতে তাকান নি। শান্ত ও মুক্ত পরিবেশে সম্পূর্ণ নিরুদ্বেগ অবস্থায় তারা আসবাবপত্র নিয়ে বিদায় হয়।

রসূলুল্লাহ্ (সা) যে সময় শত্রুর কাছ থেকে ষোল আনা প্রতিশোধ গ্রহণ করার মত শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন, সেই সময় বনূ নুযায়েরের প্রতি তিনি এহেন উদারতা প্রদর্শন করেন। এই বিশ্বাসঘাতক, কুচক্রী শত্রুদের সাথে তাঁর এহেন উদার ব্যবহার, সেই ব্যবহারের নযীর, যা তিনি মক্কা বিজয়ের পর তাঁর পুরাতন শত্রুদের সাথে করেছিলেন।

لِأَوَّلِ الْحَشْرِ---বনূ নুযায়েরের এই নির্বাসনকে কোরআন পাক 'আউয়ালে হাশর' তথা প্রথম সমাবেশ আখ্যা দিয়েছে। এর এক কারণ তফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে যে, প্রাচীনকাল থেকে তারা এক জায়গায় বসবাস করত। স্থানান্তর ও নির্বাসনের ঘটনা তাদের জীবনে এই প্রথমবার সংঘটিত হয়েছিল। এর আরও একটি কারণ এই যে, ইসলামের ভবিষ্যৎ প্রকৃত নির্দেশ ছিল আরব উপদ্বীপকে অমুসলিমদের থেকে মুক্ত করতে হবে, যাতে এটা ইসলামের এক দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত হয়। এর ফলে নির্বাসনের আকারে দ্বিতীয় সমাবেশ হওয়া অবশ্যম্ভাবী ছিল। এটা হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর খিলাফতকালে বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করে এবং নির্বাসিত হয়ে যারা খায়বরে বসতি স্থাপন করেছিল তাদেরকে আরব উপদ্বীপ ছেড়ে বাইরে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। এদিক দিয়ে বনূ নুযায়েরের এই নির্বাসন প্রথম সমাবেশ এবং হযরত উমর (রা)-এর খিলাফতকালে সংঘটিত নির্বাসন দ্বিতীয় সমাবেশ নামে অভিহিত হয়।

فَاَتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوْا — এর শাব্দিক অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কাছে এমনভাবে আগমন করলেন, যা তারা কল্পনাও করেনি। বলা বাহুল্য, আল্লাহ্‌র আগমন করার অর্থ তাঁর নির্দেশ ও নির্দেশবাহক ফেরেশতা আগমন করা।

يُخْرِبُوْنَ بُيُوْتَهُمْ بِاَيْدِيْهِمْ وَاَيْدِى الْمُؤْمِنِيْنَ — গৃহের দরজা, কপাট ইত্যাদি নিয়ে যাওয়ার জন্য তারা নিজেদের হাতে নিজেদের গৃহ ধ্বংস করছিল। পক্ষান্তরে তারা যখন দুর্গের অভ্যন্তরে ছিল, তখন তাদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করার জন্য মুসলমানগণ তাদের গৃহ ও গাছপালা ধ্বংস করছিল।

مَا قَطَعْتُمْ مِّنْ لِّيْنَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَائِمَةً عَلٰى اُصُوْلِهَا فَبِاِذْنِ اللّٰهِ

وَلِيُخْزِىَ الْفٰسِقِيْنَ — لِيْنَةٍ শব্দের অর্থ খর্জুর বৃক্ষ। বনূ নুযায়েরের খর্জুর বাগান ছিল। তারা যখন দুর্গের ভেতরে অবস্থান গ্রহণ করল, তখন কিছু কিছু মুসলমান তাদেরকে উত্তেজিত ও ভীত করার জন্য তাদের কিছু খর্জুর বৃক্ষ কর্তন করে অথবা অগ্নি সংযোগ করে খতম করে দিল। অপর কিছুসংখ্যক সাহাবী মনে করলেন, ইনশাআল্লাহ্ বিজয় তাদের হবে এবং পরিণামে এসব বাগবাগিচা মুসলমানদের অধিকারভুক্ত হবে। এই মনে করে তাঁরা বৃক্ষ কর্তনে বিরত রইলেন। এটা ছিল মতের গরমিল। পরে যখন তাঁদের মধ্যে কথাবার্তা হল, তখন বৃক্ষ কর্তনকারীরা এই মনে করে চিন্তিত হলেন যে, যে বৃক্ষ পরিণামে মুসলমানদের হবে, তা কর্তন করে তারা অন্যায় করেছেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হল। এতে উভয় দলের কার্যক্রমকে আল্লাহ্‌র ইচ্ছার অনুকূলে প্রকাশ করা হয়েছে।

রসূলের নির্দেশ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌রই নির্দেশ : হাদীস অস্বীকারকারীদের প্রতি হুঁশিয়ারি : এই আয়াতে বৃক্ষ কর্তন, পোড়ান ও অক্ষত ছেড়ে দেওয়ায় উভয় প্রকার কার্যক্রমকে আল্লাহ্‌র ইচ্ছার অনুকূলে প্রকাশ করা হয়েছে। অথচ কোরআনের কোন আয়াতে এতদুভয়ের মধ্য থেকে কোন কর্মের আদেশ উল্লেখ করা হয়নি। অতএব বাহ্যত বোঝা যায় যে, উভয় দল নিজ নিজ ইজতিহাদের মাধ্যমে এ কাজ করেছে। বেশীর বেশী তারা হয় তো রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছ থেকে এর অনুমতি নিয়ে থাকবে, কিন্তু কোরআন এই অনুমতি তথা হাদীসকে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা প্রতিপন্ন করে ব্যক্ত করেছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আদেশ জারি করার ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে এবং তিনি যে আদেশ জারি করবেন, তা আল্লাহ্‌রই আদেশ বলে গণ্য হবে। এই আদেশ পালন করা কোরআনের আয়াত পালন করার মত ফরয।

ইজতিহাদী মতভেদে কোন পক্ষকে গোনাহ্ বলা যাবে না : এই আয়াত থেকে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিধান এই জানা গেল যে, যারা ইজতিহাদ করার যোগ্যতা রাখেন, কোন ব্যাপারে

তাদের ইজতিহাদ ভিন্নমুখী হলে অর্থাৎ একদলে জায়েয ও অন্যদলে নাজায়েয বললে আল্লাহ্‌র কাছে উভয়টিই শুদ্ধ হবে। উভয় ইজতিহাদের মধ্যে কোনটিকে গোনাহ্ বলা যাবে না। এ কারণে তাদের উপর দুষ্টের দমন আইন প্রযোজ্য হবে না। কেননা, তাদের মধ্যে কোন এক পক্ষও শরীয়তানুযায়ী অশিষ্ট নয়। وَلِيُخْزِىَ الْفٰسِقِيْنَ বাক্যে বৃক্ষ কর্তন ও অগ্নি সংযোগের কারণ বর্ণনা করা হয়েছে যে, এটা অনর্থ সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং কাফিরদেরকে লাঞ্ছিত করার উদ্দেশ্যে এটা সওয়াবের কাজ।

মাস'আলা : যুদ্ধাবস্থায় কাফিরদের গৃহ বিধ্বস্ত করা, অগ্নি সংযোগ করা এবং বৃক্ষ ও শস্যক্ষেত্র ধ্বংস করা জায়েয কি না, এ সম্পর্কে ফিকহ্‌বিদগণের উক্তি বিভিন্ন রূপ। ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) বলেন : যুদ্ধাবস্থায় এসব কাজ জায়েয। কিন্তু শায়খ ইবনে হুমাম (র) বলেন : এটা তখন জায়েয, যখন এই পদ্ধতি অবলম্বন করা ব্যতীত কাফিরদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করা সুদূর পরাহত হয় অথবা যখন মুসলমানদের বিজয় অনিশ্চিত হয়। কাফিরদের শক্তি চূর্ণ করার উদ্দেশ্যে অথবা বিজয় অর্জিত না হলে তাদের ধনসম্পদ বিনষ্ট করে তাদেরকে দুর্বল করার উদ্দেশ্যে তখন এসব কাজ জায়েয হবে।—(মাযহারী)

وَمَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْهُمْ فَمَآ اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَّلَا
رِكَابٍ وَّلٰكِنَّ اللّٰهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهٗ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ
قَدِيْرٌ ۝ مَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى
الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ كَىْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةًۢ بَيْنَ
الْاَغْنِيَآءِ مِنْكُمْ ؕ وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ۗ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ۚ
وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝ لِلْفُقَرَآءِ الْمُهٰجِرِيْنَ الَّذِيْنَ
اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا
وَّيَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ تَبَوَّءُو
الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُوْنَ
فِىْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ اُوْتُوْا وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ

خَصَاصَةٌ ۗ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ جَآءُوْ مِنْۢ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَآ اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝

(৬) আল্লাহ্ বনূ নুযায়েরের কাছ থেকে তাঁর রসূলকে যে ধন-সম্পদ দিয়েছেন, তজ্জন্য তোমরা ঘোড়ায় কিংবা উটে চড়ে যুদ্ধ করনি, কিন্তু আল্লাহ্ যার উপর ইচ্ছা, তাঁর রসূলগণকে প্রাধান্য দান করেন। আল্লাহ্ সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান। (৭) আল্লাহ্ জনপদবাসীদের কাছ থেকে তাঁর রসূলকে যা দিয়েছেন, তা আল্লাহ্‌র, রসূলের, তাঁর আত্মীয়-স্বজনের, ইয়াতীমদের, অভাবগ্রস্তদের এবং মুসাফিরদের জন্য, যাতে ধনৈশ্বর্য কেবল তোমা-দের বিত্তশালীদের মধ্যেই পুঞ্জীভূত না হয়। রসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ কঠোর শাস্তিদাতা। (৮) এই ধনসম্পদ দেশত্যাগী নিঃস্বদের জন্য, যারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি লাভের অন্বেষণে এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের সাহায্যার্থে নিজেদের বাস্তুভিটা ও ধনসম্পদ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে। তারাই সত্যবাদী। (৯) যারা মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে মদীনায় বসবাস করেছিল এবং বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, তারা মুহাজিরদেরকে ভাল-বাসে, মুহাজিরদেরকে যা দেওয়া হয়েছে, তজ্জন্য তারা অন্তরে ঈর্ষা পোষণ করে না এবং নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও তাদেরকে অগ্রাধিকার দান করে। যারা মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত, তারাই সফলকাম। (১০) আর এই সম্পদ তাদের জন্য, যারা তাদের পরে আগমন করেছে। তারা বলে ঃ হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রণী আমাদের ভ্রাতাগণকে ক্ষমা কর এবং ঈমানদারদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের পালনকর্তা! নিশ্চয় আপনি দয়ালু, পরম করুণাময়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(উপরে বনূ নুযায়েরের জীবন সম্পর্কিত ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে। এখন তাদের মাল সম্পর্কিত ব্যাপারে আলোচনা করা হচ্ছে ঃ) আল্লাহ্ বনূ নুযায়েরের কাছ থেকে তাঁর রসূলকে যা কিছু দিয়েছেন, (তাতে তোমাদের কোনরূপ কষ্ট স্বীকার করতে হয়নি) তোমরা তজ্জন্য (অর্থাৎ তা হাসিল করার জন্যে) ঘোড়া ও উটে চড়ে যুদ্ধ করনি। [উদ্দেশ্য এই যে, মদীনা থেকে দুই মাইল দূরে অবস্থিত হওয়ার কারণে সফরও করতে হয়নি এবং যুদ্ধ করারও প্রয়োজন দেখা দেয়নি। মুকাবিলা যা হয়েছে, তা নেহায়েত অনুল্লেখযোগ্য।--- (রূহুল-মা'আনী) তাই এই মালে তোমাদের বন্টন ও মালিকানার অধিকার নেই---

গনীমতের মালে যেরূপ হয়ে থাকে]। কিন্তু (আল্লাহ্‌র রীতি এই যে) তিনি তাঁর রসূলগণকে (শত্রুদের মধ্য থেকে] যার উপর ইচ্ছা, কর্তৃত্ব দান করেন (অর্থাৎ শত্রুকে ত্রাসের মাধ্যমে পরাস্ত করে দেন, যাতে কোন রকম কষ্ট স্বীকার করতে না হয়। সেমতে রসূলগণের মধ্য থেকে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রসূল মুহাম্মদ (সা)-কে বনূ নুযায়েরের ধনসম্পদের উপর এমনিভাবে কর্তৃত্ব দান করেছেন। কাজেই এতে তোমাদের কোন অধিকার নেই ; বরং একে মালিকসুলভ ব্যবহার করার পূর্ণ ক্ষমতা রসূলেরই আছে)। আল্লাহ্ তা'আলা সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান। (সুতরাং তিনি যেভাবে ইচ্ছা, শত্রুদেরকে পরাস্ত করবেন এবং যেভাবে ইচ্ছা, তাঁর রসূলকে ক্ষমতা দেবেন। বনূ নুযায়েরের ধনসম্পদের ক্ষেত্রে যেমন এই বিধান, তেমনিভাবে) আল্লাহ্ তা'আলা (এই পন্থায়) অন্যান্য জনপদের (কাফির) অধিবাসীদের কাছ থেকে তাঁর রসূলকে যা দিয়েছেন, (যেমন ফদকের বাগান এবং খায়বরের অংশ বিশেষ এই পন্থায়ই করতলগত হয়েছিল, তাতেও তোমাদের কোন মালিকানার অধিকার নেই ; বরং) তা আল্লাহ্‌র হক, (তিনি যেভাবে ইচ্ছা, তা ব্যয় করার আদেশ দেবেন) রসূলের (হক ; আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে নিজ বিবেচনা অনুযায়ী এই মাল ব্যয় করার ক্ষমতা দিয়েছেন) এবং (তাঁর) আত্মীয়-স্বজনের (হক) এবং ইয়াতীমদের (হক) এবং নিঃস্বদের (হক) এবং মুনাফিকদের [হক অর্থাৎ তারা সবাই রসূলের বিবেচনা অনুসারে এই মাল ব্যয় করার পাত্র। শুধু তারাই নয় রসূলুল্লাহ্ (সা) নিজের মতে যাকেই দিতে চান, সে-ও তাদের অন্তর্ভুক্ত। জিহাদে অংশগ্রহণকারীদের যখন এই মালে কোন অধিকার নেই, তখন উপরোক্ত প্রকার লোকগণ, যারা জিহাদে অংশগ্রহণ করেনি তাদেরও এই মালে কোন অধিকার থাকবে না--এই সন্দেহ নিরসনের জন্য সম্ভবত উপরোক্ত প্রকার লোকদের বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু আয়াতে ইয়াতীম, নিঃস্ব, মুসাফির ইত্যাদি বিশেষ গুণসহ তাদের উল্লেখ করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তারা এসব গুণের কারণে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র ইচ্ছাক্রমে এই মাল পেতে পারে। জিহাদে যোগদান করার সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আত্মীয়-স্বজন হওয়াও উপরোক্ত গুণসমূহের অন্যতম। তাঁদেরকে এই মাল দেওয়ার কারণ এই যে, তাঁরা সবাই রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাহায্যকারী ছিলেন এবং বিপদ মুহূর্তে কাজে লাগতেন। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র ওফাতের সাথে সাথে তাঁদের এই অংশ রহিত হয়ে যায়। সূরা আনফালের আয়াতে তা বর্ণিত হয়েছে। এই বিধান এ জন্য] যাতে তা (অর্থাৎ এই ধনসম্পদ) কেবল তোমাদের বিত্তশালীদের মধ্যেই পুঞ্জীভূত না হয়ে যায় ; (যেমন মূর্খতা যুগে গনীমতের মাল ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সব বিত্তবানরা হজম করে ফেলত এবং অভাবগ্রস্তরা বঞ্চিত থাকত। তাই আল্লাহ্ তা'আলা বিষয়টি রসূলের মতামতের উপর ন্যস্ত করেছেন এবং ব্যয় করার খাতও বলে দিয়েছেন। যাতে মালিক হওয়া সত্ত্বেও তিনি অভাবগ্রস্তদের মধ্যে এবং উপযোগিতার স্থলে ব্যয় করবেন। যখন জানা গেল যে, রসূলের ইখতিয়ারে থাকাই মঙ্গলজনক, তখন) রসূল তোমাদেরকে যা দেন তা গ্রহণ কর এবং যা (নিতে) নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক (অন্যান্য) যাবতীয় ক্রিয়াকর্মেও তাই বিধান এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ (বিরুদ্ধাচরণের কারণে) কঠোর শাস্তিদাতা। (উপরোক্ত ধনসম্পদে এমনিতে সব অভাবগ্রস্তরই হক আছে, কিন্তু) মুহাজির অভাবগ্রস্তদের (বিশেষভাবে) এতে হক আছে, যাদেরকে তাদের বাস্তুভিটা ও

ধনসম্পদ থেকে (জোরজবরে অন্যায়ভাবে) বহিষ্কার করা হয়েছে, (অর্থাৎ কাফিরদের নিপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে তারা বাস্তুভিটা ছেড়ে হিজরত করতে বাধ্য হয়েছে। এই হিজরত দ্বারা) তারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ (অর্থাৎ জান্নাত) ও সন্তুষ্টি অন্বেষণ করে, (কোন পার্থিব স্বার্থ হাসিলের জন্য হিজরত করেনি) এবং তারা আল্লাহ্ ও রসূলের (ধর্মের) সাহায্য করে। তারাই (ঈমানে) সত্যবাদী (এই সম্পদ তাদের জন্যও) যারা দারুল-ইসলামে (অর্থাৎ মদীনায়) ও ঈমানে মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে স্থিতিশীল ছিল। (এখানে আনসারগণকে বোঝানো হয়েছে। তাঁরা ছিলেন মদীনার বাসিন্দা। তাই তাঁরা পূর্বেই মদীনায় স্থিতিশীল ছিলেন। ঈমানের পূর্বে স্থিতিশীল হওয়ার অর্থ এই নয় যে, সব আনসারের ঈমান সব মুহাজিরের ঈমানের অগ্রে ছিল। বরং অর্থ এই যে, মুহাজিরগণের মদীনায় আগমনের পূর্বেই তাঁরা ঈমান গ্রহণ করেছিলেন)। তাঁরা মুহাজিরগণকে ভালবাসে এবং মুহাজিরগণকে (গনীমতের মাল ইত্যাদি) যা দেওয়া তজ্জন্য তাঁরা (আনসাররা) অন্তরে কোন ঈর্ষা পোষণ করে না। (বরং আরও বেশী ভালবাসে) নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও (পানাহার ইত্যাদিতে) তাঁদেরকে অগ্রাধিকার দান করে। (অর্থাৎ মাঝে মাঝে নিজেরা না খেয়ে মুহাজির ভাইকে খাইয়ে দেয়। বাস্তবিকই) যারা মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত (যেমন আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে লোভ-লালসা ও তদনুযায়ী কাজ করা থেকে মুক্ত রেখেছেন), তারাই সফলকাম। (আর এই সম্পদ তাদের জন্যও) যারা (দারুল ইসলাম অথবা হিজরতে অথবা দুনিয়াতে) তাদের (অর্থাৎ উপরোক্ত মুহাজিরদের) পরে আগমন করেছে, (কিংবা আগমন করবে)। তারা দোয়া করে ঃ হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রণী আমাদের ভ্রাতাগণকে ক্ষমা কর (শুধু ঈমানে অগ্রণী কিংবা হিজরতের উপর নির্ভরশীল কামিল ঈমানে অগ্রণী যাই হোক না কেন)। এবং আমাদের অন্তরে ঈমানদারদের বিরুদ্ধে কোন হিংসা বিদ্বেষ রেখো না। (এই দোয়ায় সমসাময়িকগণও শামিল রয়েছে)। হে আমাদের পালনকর্তা! নিশ্চয় আপনি দয়ালু, পরম করুণাময়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَىٰ رَسُوْلِهٖ مِنْهُمْ — أَفَاءَ শব্দটি فَيْءٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ প্রত্যাবর্তন করা। দুপুরের পরবর্তী পূর্বদিকে প্রত্যাবর্তনকারী ছায়াকেও فَيْءٌ বলা হয়। কাফিরদের কাছ থেকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদের স্বরূপ এই যে, কাফিররা বিদ্রোহী হওয়ার কারণে তাদের ধনসম্পদ সরকারের পক্ষে বাজেয়াপ্ত হয়ে যায় এবং তাদের মালিকানা থেকে বের হয়ে প্রকৃত মালিক আল্লাহ তা'আলার দিকে ফিরে যায়। তাই এগুলো অর্জনকে أَفَاءَ শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। এর অর্থ তো এই ছিল যে, কাফিরদের কাছ থেকে অর্জিত সকল প্রকার ধনসম্পদকেই فَيْءٌ বলা হত। কিন্তু যুদ্ধ ও জিহাদের মাধ্যমে যে ধনসম্পদ অর্জিত হয়, তাতে মানুষের কর্ম ও অধ্যবসায়েরও এক প্রকার দখল থাকে। তাই এই প্রকার ধনসম্পদকে 'গনীমত' শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করে এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَاعْلَمُوْا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ—কিন্তু যে ধনসম্পদ অর্জনে যুদ্ধ ও জিহাদের প্রয়োজন পড়ে না, তাকে فَيْءٌ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতের সারমর্ম এই যে, যে ধনসম্পদ যুদ্ধ ও জিহাদ ব্যতিরেকে অর্জিত হয়েছে, তা মুজাহিদ ও যোদ্ধাদের মধ্যে যুদ্ধলব্ধ সম্পদের আইনানুযায়ী বন্টন করা হবে না। বরং তা পুরোপুরিভাবে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র ইখতিয়ারে থাকবে। তিনি যাকে যতটুকু ইচ্ছা করবেন, দেবেন অথবা নিজের জন্য রাখবেন। তবে যে কয়েক প্রকার হকদার নির্দিষ্ট করা হয়েছে, তাদের মধ্যেই এই সম্পদের বন্টন সীমিত থাকতে হবে। এ প্রসঙ্গে পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

مَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى—এখানে اَهْلِ قُرٰى বলে বনূ নুযায়ের এবং তাদের মত বনূ কোরায়যা ইত্যাদি গোত্র বোঝানো হয়েছে, যাদের ধনসম্পদ যুদ্ধ ব্যতিরেকেই অর্জিত হয়েছিল। এরপর পাঁচ প্রকার হকদারদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে।

এসব আয়াতে উপরোক্ত প্রকার ধনসম্পদের বিধান, হকদার ও হকদারদের মধ্যে বন্টন করার পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। সূরা আনফালের শুরুতে গনীমতের মাল ও ফায়-এর মালের মধ্যে যে পার্থক্য, তা সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও জিহাদের ফলশ্রুতিতে যে ধনসম্পদ মুসলমানদের হস্তগত হয়, তাই গনীমতের মাল এবং যুদ্ধ ও জিহাদ ব্যতিরেকে যা অর্জিত হয়, তা ফায়-এর মাল। কাফিররা যে ধনসম্পদ রেখে পলায়ন করে কিংবা যা সম্মতিক্রমে জিযিয়া, খারাজ কিংবা বাণিজ্যিক ট্যাক্সের আকারে প্রদান করে, সবই ফায়-এর অন্তর্ভুক্ত।

এর কিঞ্চিত বিবরণ মা'আরেফুল-কোরআনের চতুর্থ খণ্ডে সূরা আনফালের শুরুতে এবং আরও কিছু বিবরণ সূরা আনফালের ৪১ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, সূরা আনফালের ৪১ নং আয়াতে গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ সম্পর্কে যে ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে, এখানে ফায়-এর সম্পর্কে প্রায় একই ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। সূরা আনফালে বলা হয়েছে ঃ

وَاعْلَمُوْا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ -

উভয় আয়াতে ছয় প্রকার হকদারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে---আল্লাহ্, রসূল, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন, মুসাফির। বলা বাহুল্য, আল্লাহ্ তা'আলা তো ইহকাল, পরকাল এবং সমগ্র সৃষ্ট জগতের আসল মালিক। অংশ বর্ণনায় তাঁর নাম নিছক বরকতের জন্য উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে এর মাধ্যমে ইঙ্গিত হয়ে যায় যে, এই ধনসম্পদ অভিজাত, হালাল ও পূত-পবিত্র। এক্ষেত্রে অধিকাংশ তফসীরবিদের বক্তব্য তাই।---(মাযহারী)

আল্লাহ্ তা'আলার নাম উল্লেখ করার ফলে এই ধনসম্পদের আভিজাত্য, শ্রেষ্ঠত্ব ও পবিত্র হওয়ার দিকে কিভাবে ইঙ্গিত হল, এর বিস্তারিত বিবরণ সূরা আনফালের তফসীরে প্রদান করা হয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা পয়গম্বরগণের জন্য মুসলমানদের কাছ থেকে অর্জিত সদকার মাল হালাল করেন নি। ফায় ও গনীমতের মাল কাফিরদের কাছ থেকে অর্জিত হয়। কাজেই প্রশ্ন দেখা দেয় যে, এই মাল পয়গম্বরগণের জন্য কিরূপে হালাল হল? এ স্থলে আল্লাহ্ তা'আলার নাম উল্লেখ করে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে যে, প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক বস্তুর মালিক আল্লাহ্ তা'আলা। তিনি কৃপাবশত বিশেষ আইনের অধীনে মানুষকে মালিকানা দান করেছেন। কিন্তু যে মানুষ বিদ্রোহী হয়ে যায়, তাদেরকে সঠিক পথে আনার জন্য প্রথমে পয়গম্বরগণকে ঐশী নির্দেশসহ প্রেরণ করা হয়েছে। যারা এতেও সঠিক পথে আসে না, তাদেরকে কমপক্ষে ইসলামী আইনের বশ্যতা স্বীকার করে নির্ধারিত জিযিয়া, খারাজ ইত্যাদি আদায় করে বসবাস করার অধিকার দেওয়া হয়েছে। যারা এর বিরুদ্ধেও বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করে, তাদের মুকাবিলায় জিহাদ ও যুদ্ধের আদেশ দেওয়া হয়েছে। এর অর্থ এই যে, তাদের জান ও মাল সম্মানার্হ নয়। তাদের ধনসম্পদ আল্লাহ্র সরকারে বাজেয়াপ্ত। জিহাদ ও যুদ্ধের মাধ্যমে তাদের কাছ থেকে যে ধনসম্পদ অর্জিত হয়, তা কোন মানুষের ব্যক্তিগত মালিকানাধীন নয়---বরং তা সরাসরি আল্লাহ্র মালিকানায় ফিরে যায়। 'ফায়' শব্দের মধ্যে এই ফিরে যাওয়ার দিকে ইঙ্গিতও আছে। কারণ, এর আসল অর্থ ফিরে যাওয়া। সত্যিকার মালিক আল্লাহ্ তা'আলার মালিকানায় ফিরে যাওয়ার কারণেই এই সম্পদকে 'ফায়' বলা হয়। এখন এতে মানুষের মালিকানার কোন দখল নেই। যেসব হকদারকে এ থেকে অংশ দেওয়া হবে; তা সরাসরি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে দেওয়া হবে। কাজেই এই ধনসম্পদ আকাশ থেকে বর্ষিত পানি এবং স্বউদগত ঘাসের ন্যায় আল্লাহ্র দান হিসাবে মানুষের জন্য হালাল ও পবিত্র হবে।

সারকথা এই যে, এ স্থলে আল্লাহ্র নাম উল্লেখ করার মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে, এসব ধনসম্পদ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলার। তাঁর পক্ষ থেকে হকদারদেরকে প্রদান করা হয়। এটা কারও সদকা খয়রাত নয়।

এখন সর্বমোট হকদার পাঁচ রয়ে গেল---রসূল, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন ও মুসাফির। গনীমতের পঞ্চমাংশের হকদারও তারাই, যা সূরা আনফালে বর্ণিত হয়েছে। গনীমত ও ফায় উভয় প্রকারের বিধান এই যে, এসব ধনসম্পদ প্রকৃতপক্ষে রসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর পরবর্তী খোলাফায়ে রাশেদীনের সম্পূর্ণ ইখতিয়ারে থাকবে। তাঁরা ইচ্ছা করলে এগুলো কাউকে না দিয়ে মুসলিম জনগণের স্বার্থে বায়তুলমালে জমা করতে পারেন এবং ইচ্ছা করলে বণ্টনও করতে পারেন। তবে বণ্টন করলে তা উপরোক্ত পাঁচ প্রকার হকদারের মধ্যে সীমিত থাকতে হবে।---(কুরতুবী)

খোলাফায়ে রাশেদীন ও অন্যান্য সাহাবায়ে কিরামের কর্মধারাদৃষ্টে প্রমাণিত হয় যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আমলে তো ফায়-এর মাল তাঁর ইখতিয়ারে ছিল। তিনি যেখানে ভাল বিবেচনা করতেন ব্যয় করতেন। তাঁর ওফাতের পর এই মাল খলীফাগণের ইখতিয়ারে ছিল।

এই মালে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র যে অংশ ছিল তা তাঁর ওফাতের পর মওকুফ হয়ে যায়। তাঁর আত্মীয়বর্গকে এই মাল থেকে অংশ দেওয়ার দ্বিবিধ কারণ ছিল। এক. তাঁরা ইসলামী কর্মকাণ্ডে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাহায্য করতেন। তাই বিত্তশালী আত্মীয়বর্গকেও এ থেকে অংশ দেওয়া হত।

দুই. রসূলুল্লাহ্ (সা)-র স্বজনদের জন্য সদকার মাল হারাম করা হয়েছিল। তাই তাঁদের নিঃস্ব ও অভাবগ্রস্তগণকে ফায়-এর মাল থেকে এর পরিবর্তে অংশ দেওয়া হত। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র ওফাতের পর সাহায্য খতম হয়ে যায়। ফলে বিত্তশালী স্বজনদের অংশও রসূল (সা)-এর অংশের ন্যায় মওকুফ হয়ে যায়। তবে অভাবগ্রস্ত আত্মীয়-স্বজনের অংশ অভাবগ্রস্ততার কারণে অব্যাহত রয়েছে। তারা অন্য অভাবগ্রস্তদের মুকাবিলায় অগ্রগণ্য হবেন।---(হিদায়া)

كَيْلَا يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ---যে সম্পদ পরস্পরে আদান-প্রদান হয়, তাকে دُوْلَةً বলা হয়।---(কুরতুবী) আয়াতের অর্থ এই যে, উপরোক্ত ধনসম্পদের হকদার নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, যাতে এই সম্পদ কেবল তোমাদের ধনী ও বিত্তশালী-দের মধ্যকার পুঞ্জীভূত সম্পদ না হয়ে যায়। এতে মূর্খতা যুগের একটি কু-প্রথার মূলোৎ-পাটনের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। কু-প্রথা ছিল এই যে, এ ধরনের সকল ধন-সম্পদ কেবল বিত্তশালীরাই কুক্ষিগত করে নিত এবং এতে নিঃস্ব ও দরিদ্রদের কোন অংশ থাকত না।

সম্পদ পুঞ্জীভূত করার প্রতি ইসলামী আইনের মরণাঘাত ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বিশ্ব পালক। তাঁর সৃজিত হওয়ার দিক দিয়ে মানবিক প্রয়োজনের সম্পদরাজিতে সকল মানুষের সমান অধিকার আছে। এতে মু'মিন ও কাফিরের মধ্যেও কোন পার্থক্য রাখা হয়নি। অতএব পরিবারগত ও শ্রেণীগত এবং ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে পার্থক্য রাখার তো প্রশ্নই উঠে না। বায়ু, শূন্যমণ্ডল, সূর্য, চন্দ্র ও বিভিন্ন গ্রহ-উপগ্রহের আলো, শূন্যমণ্ডলে সৃষ্ট মেঘমালা, বৃষ্টি---এগুলো মানুষের সহজাত ও আসল প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী। এগুলো ব্যতীত মানুষ সামান্যক্ষণও জীবিত থাকতে পারে না। আল্লাহ্ তা'আলা এগুলো স্বহস্তে রেখে এভাবে বন্টন করেছেন, যাতে প্রতি স্তর ও প্রতি ভূখণ্ডের দুর্বল ও সবল মানুষ এগুলো দ্বারা সমভাবে উপকৃত হতে পারে। এ ধরনের দ্রব্য সামগ্রীকে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় প্রজ্ঞা বলে সাধারণ মানুষের ধরা-ছোঁয়া ও একচ্ছত্র অধিকারের উর্ধ্বে রেখেছেন। ফলে এগুলোর উপর ব্যক্তিগত দখল প্রতিষ্ঠা করার সাধ্য কারও নেই। এগুলো ওয়াক্ফে আম। কোন বৃহত্তর সরকার ও পরাশক্তি এগুলোকে কুক্ষিগত করতে সক্ষম নয়। সৃষ্ট জীব সর্বত্রই এগুলো সমভাবে লাভ করে।

প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর দ্বিতীয় কিস্তি হচ্ছে ভূগর্ভ থেকে উদগত পানি ও আহার্য বস্তু। এগুলো যদিও সাধারণ ওয়াক্ফ নয়, কিন্তু ইসলামী আইনে পাহাড়, অনাবাদী জঙ্গল ও প্রাকৃতিক জলস্রোতকে সাধারণ ওয়াক্ফ রেখে এগুলোর কতকাংশের উপর বিশেষ বিশেষ লোকের বৈধ মালিকানার অধিকারও দেওয়া হয়। অপরদিকে অবৈধ দখল প্রতিষ্ঠা-কারীরাও ভূমির উপর দখল প্রতিষ্ঠা করে নেয়। কিন্তু স্বাভাবিকভাবে কোন বৃহত্তর পুঁজিপতি

ও দরিদ্র, কৃষক ও শ্রমিকদেরকে সাথে না নিয়ে ভূগর্ভে নিহিত সম্পদরাজি অর্জন করতে পারে না। কাজেই দখল প্রতিষ্ঠা করা সত্ত্বেও পুঁজিপতিরা অপরাপর দরিদ্রদেরকে অংশীদার করতে বাধ্য থাকে।

তৃতীয় কিস্তি হচ্ছে স্বর্ণ, রৌপ্য ও টাকা-পয়সা। এগুলো আসল প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রীর তালিকাভুক্ত নয়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা এগুলোকে সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী অর্জনের উপায় করেছেন। খনি থেকে উত্তোলন করার পর বিশেষ আইনের অধীনে এগুলো উত্তোলনকারীর মালিকানাধীন হয়ে যায়। এরপর বিভিন্ন পন্থায় অন্য লোকদের দিকে মালিকানা স্থানান্তরিত হতে থাকে। যদি সমগ্র মানব সমাজের মধ্যে এগুলো যথাযথ পন্থায় আবর্তিত হয়, তবে কোন মানুষ ক্ষুধার্ত ও উলঙ্গ থাকার কথা নয়। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে মানুষ এগুলো দ্বারা কেবল নিজেই উপকৃত হতে চায়, অন্যান্য লোকও উপকৃত হোক, তা চায় না। এই কার্পণ্য ও লালসা দুনিয়াতে সম্পদ ও পুঁজি আহরণের নতুন ও পুরাতন অনেক পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে, যার ফলে সম্পদের আবর্তন কেবল পুঁজিপতি ও বিত্তশালীদের মধ্যেই সীমিত হয়ে পড়েছে এবং সাধারণ দরিদ্র ও নিঃস্বদেরকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে। এর অশুভ প্রতিক্রিয়াই আজ দুনিয়াতে কমিউনিজম ও সোশ্যালিজমের মত অযৌক্তিক মতবাদের জন্ম দিয়েছে।

ইসলামী আইন একদিকে ব্যক্তি মালিকানার প্রতি এতটুকু সম্মান প্রদর্শন করেছে যে, এক ব্যক্তির সম্পদকে তার প্রাণের সমান এবং প্রাণকে বায়তুল্লাহ্র সমান গুরুত্ব দান করেছে। এর উপর কারও অবৈধ হস্তক্ষেপকে কঠোরভাবে বারণ করেছে। অপরদিকে যে হাত অবৈধ পন্থায় এই সম্পদের দিকে অগ্রসর হয় সেই হাত কেটে দিয়েছে এবং প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে দ্রব্যসামগ্রীর উপর কোন বিশেষ ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠী কর্তৃক একচ্ছত্র অধিকার প্রতিষ্ঠা করার সকল দরজা বন্ধ করে দিয়েছে।

অর্থোপার্জনের প্রচলিত পন্থাসমূহের মধ্যে সুদ সট্টা ও জুয়ার মাধ্যমে সম্পদ সংকুচিত হয়ে কতিপয় ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর মধ্যে সীমিত হয়ে যায়। ইসলাম এগুলোকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করে ব্যবসা-বাণিজ্য, ইজারা ইত্যাদি কাজ-কারবারে এগুলোর মূল কেটে দিয়েছে। যে অর্থ-সম্পদ কোন ব্যক্তির কাছে বৈধ পন্থায় সঞ্চিত হয়, তাতেও যাকাত, ওশর, ফিতরা, কাফ্ফারা ইত্যাদি ফরয কর্মের আকারে এবং অতিরিক্ত স্বেচ্ছামূলক দানের আকারে দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছে। এসব ব্যয়বহনের পরও মৃত্যুর সময় ব্যক্তির কাছে যে অর্থ-সম্পদ অবশিষ্ট থেকে যায়, তা এক বিশেষ প্রজ্ঞাভিত্তিক নীতিমালা অনুযায়ী মৃতের নিকট থেকে নিকটতম স্বজনদের মধ্যে বন্টন করে দিয়েছে। ইসলাম এই ত্যাজ্য সম্পদ সাধারণ দরিদ্রদের মধ্যে বন্টন করার আইন রচনা করেনি। কারণ, এরূপ করলে মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর পূর্বেই তার সম্পদ অযথা ব্যয় করে নিঃশেষ করে দিতে স্বভাবগত কারণেই আগ্রহী হত। এখন তারই আত্মীয় ও প্রিয়জন পাবে দেখে তার অন্তরে এই প্রেরণা লালিত হবে না।

অর্থোপার্জনের অপর পন্থা হচ্ছে যুদ্ধ ও জিহাদ। এই পন্থায় অর্জিত ধনসম্পদ সুষ্ঠু বন্টনের জন্য ইসলাম যে নীতিমালা অবলম্বন করেছে, তার কিয়দংশ সূরা আনফালে এবং

কিয়দংশ এই সূরায় বর্ণিত হয়েছে। কেমন জ্ঞানপাপী তারা, যারা ইসলামের এহেন ন্যায়ানুগ ও প্রজ্ঞাভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে ছেড়ে নতুন ইজম অবলম্বন করে বিশ্ব শান্তির পায়ে কুঠারাঘাত করছে।

এই—وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ আয়াত ফায়-এর মাল বণ্টন সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে এবং এর উপযুক্ত অর্থ এই যে, ফায়-এর মাল সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা হকদারদের শ্রেণী বর্ণনা করেছেন ঠিক; কিন্তু তাদের মধ্যে কাকে কতটুকু দেওয়া হবে, তা নির্ধারণ করা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সুবিবেচনার উপর রেখে দিয়েছেন। তাই এই আয়াতে মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তিনি যাকে যে পরিমাণ দেন, তা সন্তুষ্ট হয়ে গ্রহণ কর এবং যা দেন না, তা পেতে চেষ্টা করো না। অতঃপর اتَّقُوا اللَّهَ বলে এই নির্দেশকে জোরদার করা হয়েছে। অর্থাৎ এ ব্যাপারে ভ্রান্ত ছলচাতুরির মাধ্যমে অতিরিক্ত আদায় করে নিলেও আল্লাহ্ তা'আলা সব খবর রাখেন। তিনি এজন্য শাস্তি দেবেন।

রসূলের নির্দেশ কোরআনের নির্দেশের ন্যায় অবশ্য পালনীয়ঃ কিন্তু আয়াতের ভাষা ধন সম্পদের সাথেই বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত নয়; বরং শরীয়তের বিধি-বিধানও এতে দাখিল আছে। তাই ব্যাপক ভঙ্গিতে আয়াতের অর্থ এই যে, যে কোন নির্দেশ অথবা ধনসম্পদ অথবা অন্য কোন বস্তু তিনি কাউকে দেন, তা তার গ্রহণ করা উচিত এবং তদনুযায়ী কাজ করতে সম্মত হওয়া উচিত। পক্ষান্তরে তিনি যে বিষয় নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাকা দরকার।

অনেক সাহাবায়ে কিরাম আয়াতের এই ব্যাপক অর্থ অবলম্বন করে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রত্যেক নির্দেশকে কোরআনের নির্দেশের অনুরূপ অবশ্য পালনীয় সাব্যস্ত করেছেন। কুরতুবী বলেনঃ আয়াতে اٰتٰى শব্দের বিপরীতে نَهٰى শব্দ ব্যবহার করায় বোঝা যায় যে, এখানে اٰتٰى শব্দের অর্থ اَمَرَ অর্থাৎ যা আদেশ করেন। কারণ এটাই نهى এর বিশুদ্ধ বিপরীত শব্দ। তবে কোরআন পাক এর পরিবর্তে اٰتٰى শব্দ এজন্য ব্যবহার করেছে যাতে 'ফায়'-এর মাল বণ্টন সম্পর্কিত বিষয়বস্তুও এতে শামিল থাকে। কারণ, এ প্রসঙ্গেই আয়াতটি আনা হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা) জনৈক ব্যক্তিকে ইহ্রাম অবস্থায় সেলাই করা কাপড় পরিধান করতে দেখে তা খুলে ফেলতে আদেশ করেন। লোকটি বললঃ আপনি এ সম্পর্কে কোরআনের কোন আয়াত বলতে পারেন কি, যাতে সেলাই করা কাপড় পরিধান করতে নিষেধ করা হয়েছে? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ, এ সম্পর্কে আয়াত আছে; অতঃপর তিনি وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ আয়াতটি পাঠ করে দিলেন। ইমাম শাফেয়ী একবার

উপস্থিত লোকজনকে বললেন ঃ আমি তোমাদের প্রত্যেক প্রশ্নের জওয়াব কোরআন থেকে দিতে পারি। জিজ্ঞাসা কর যা জিজ্ঞাসা করতে চাও। এক ব্যক্তি আরয করল ঃ এক ব্যক্তি ইহ্‌রাম অবস্থায় প্রজাপতি মেরে ফেলল, এর বিধান কি? ইমাম শাফেয়ী (র) এই আয়াত তিলাওয়াত করে হাদীস থেকে এর বিধান বর্ণনা করে দিলেন।---(কুরতুবী)

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِيْنَ---রুকূর শেষ পর্যন্ত এই কয়েকটি আয়াতে দরিদ্র মুহাজির, আনসার ও তাঁদের পরবর্তী সাধারণ উম্মত সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। ব্যাকরণিক দিক দিয়ে لِلْفُقَرَاءِ-শব্দটি لذى القربى থেকে بدل হয়েছে, যা পূর্বের আয়াতে আছে।---(মাযহারী) আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, পূর্বের আয়াতে সাধারণ ইয়াতীম, মিসকীন ও মুসাফিরগণকে অভাবগ্রস্ততার কারণে ফায়-এর মালের হকদার গণ্য করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে এর অতিরিক্ত ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, যদিও সকল দরিদ্র ও মিসকীন এই মালের হকদার, কিন্তু তাদের মধ্যে দরিদ্র মুহাজির ও আনসারগণ অগ্রগণ্য। কারণ, তাঁদের ধর্মীয় খিদমত এবং ব্যক্তিগত গুণ-গরিমা সুবিদিত।

সদকার মালে ধর্মপরায়ণ ও দীনের খিদমতে নিয়োজিত অভাবগ্রস্তদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত ঃ এ থেকে বোঝা গেল যে, সদকার মাল বিশেষত ফায়-এর মাল সাধারণ অভাবগ্রস্তদের অভাব দূর করার জন্য হলেও তাদের মধ্যে যারা সৎকর্মপরায়ণ, ধার্মিক, বিশেষত দীনের খিদমতে নিয়োজিত তালিবে-ইলম ও আলিম, তাদেরকে অন্যদের চাইতে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। এ কারণেই ইসলামী রাষ্ট্রসমূহে শিক্ষা, প্রচার ও জনসংস্কারের কাজে নিয়োজিত আলিম, মুফতী ও বিচারকগণকে ফায়-এর মাল থেকে খোরপোশ দেওয়ার প্রচলন ছিল। কেননা, আলোচ্য আয়াতসমূহে সাহাবায়ে কিরামকেও প্রথমে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। এক. মুহাজির, যাঁরা সর্বপ্রথম ইসলাম ও রসূলুল্লাহ্ (সা)-র জন্য অভূতপূর্ব ত্যাগ স্বীকার করেন এবং ইসলামের জন্য ঘোরতর বিপদাপদ হাসিমুখে বরণ করে নেন। অবশেষে সহায়-সম্পত্তি স্বদেশ ও আত্মীয়-স্বজনের মায়া কাটিয়ে মদীনার দিকে হিজরত করেন। দুই. আনসার যাঁরা রসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর সঙ্গী-সাথী মুহাজিরগণকে মদীনায় ডেকে এনে সারা দুনিয়ার মানুষকে নিজেদের শত্রুতে পরিণত করেন এবং তাঁদের এমন আতিথেয়তা করেন, যার নজীর বিশ্বের ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যায় না। এই দুই শ্রেণীর পর তৃতীয় শ্রেণী সেসব মুসলমানের সাব্যস্ত করা হয়েছে, যারা সাহাবায়ে কিরামের পর ইসলাম গ্রহণ করে তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন। কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সব মুসলমান এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। পরবর্তী আয়াতসমূহে এই তিন শ্রেণীর কিছু শ্রেষ্ঠত্ব, গুণ গরিমা ও দীনের খিদমত বর্ণনা করা হয়েছে।

মুহাজিরদের শ্রেষ্ঠত্ব ঃ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا وَّيَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ

এতে মুহাজিরগণের প্রথম গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তাঁরা স্বদেশ ও সহায়-সম্পত্তি থেকে বহিষ্কৃত হয়েছেন। তাঁরা মুসলমান এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সমর্থক ও সাহায্যকারী, শুধু এই অপরাধে মক্কার কাফিররা তাঁদের উপর অকথ্য নির্যাতন চালায়। শেষ পর্যন্ত তাঁরা মাতৃভূমি, ধনসম্পদ ও বাস্তুভিটা ছেড়ে হিজরত করতে বাধ্য হন। তাঁদের কেউ কেউ ক্ষুধার তাড়নায় অতিষ্ঠ হয়ে পেটে পাথর বেঁধে নিতেন এবং কেউ কেউ শীতবস্ত্রের অভাবে গর্ত খনন করে তাতে শীতের দাপট থেকে আত্ম রক্ষা করতেন।---(মাযহারী, কুরতুবী)

মুসলমানদের ধনসম্পদের উপর কাফিরদের দখল সম্পর্কিত বিধান ঃ আলোচ্য আয়াতে মুহাজিরগণকে ফকীর বলা হয়েছে। ফকীর সেই ব্যক্তি, যার মালিকানায় কিছু না থাকে অথবা নিসাব পরিমাণ কোন কিছু না থাকে। মক্কায় তাঁদের অধিকাংশই ধন-সম্পদ ও সহায়-সম্বলের অধিকারী ছিলেন। হিজরতের পরও যদি সেই ধনসম্পদ তাঁদের মালিকানায় থাকত, তবে তাঁদেরকে ফকীর ও নিঃস্ব বলা ঠিক হত না। কোরআন পাক তাঁদেরকে ফকীর বলে ইঙ্গিত করেছে যে, হিজরতের পর তাঁদের মক্কায় পরিত্যক্ত বিষয়-সম্পত্তি তাঁদের মালিকানা থেকে বের হয়ে কাফিরদের দখলে চলে গেছে।

এ কারণেই ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম মালেক (র) বলেন ঃ যদি মুসল-মান কোন জায়গায় হিজরত করে চলে যায় এবং তাদের পরিত্যক্ত বিষয়-সম্পত্তি কাফিররা দখল করে নেয় অথবা আল্লাহ্ না করুন কোন দারুল-ইসলাম কাফিররা অধিকার করে মুসলমানদের ধনসম্পদ ছিনিয়ে নেয়, তবে এসব ধনসম্পদ কাফিরদের পুরোপুরি দখলের পর তাদের মালিকানায় চলে যায়। এগুলো বেচাকেনা ইত্যাদি কার্যকলাপ আইনসিদ্ধ হয়। বিভিন্ন হাদীস থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। এ স্থলে তফসীরে মাযহারীতে সেসব হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে।

মুহাজিরগণের দ্বিতীয় গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ يَبْتَغُوْنَ فَضْلاً مِّنَ اللهِ وَرِضْوَانًا অর্থাৎ তাঁরা কোন জাগতিক স্বার্থের বশবর্তী হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন নি এবং হিজরত করে মাতৃভূমি ও ধনসম্পদ ত্যাগ করেন নি বরং কেবলমাত্র আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টিই তাঁদের কাম্য ছিল। এ থেকে তাঁদের পূর্ণ আন্তরিকতা বোঝা যায়। فضل শব্দটি প্রায়শ পার্থিব নিয়ামতের জন্য এবং رضوان শব্দটি পারলৌকিক নিয়ামতের জন্য ব্যবহৃত হয়। কাজেই অর্থ এই দাঁড়ায় যে, তাঁরা তাঁদের সাবেক ঘরবাড়ী, বিষয় সম্পত্তি ইত্যাদি ছেড়ে দিয়ে এখন ইসলামের ছায়াতলে সাংসারিক প্রয়োজন এবং পরকালের নিয়ামত কামনা করছেন।

মুহাজিরগণের তৃতীয় গুণ এই বর্ণিত হয়েছে ঃ وَيَنْصُرُوْنَ اللهَ وَرَسُوْلَهٗ

অর্থাৎ আল্লাহ্ ও রসূলকে সাহায্য করার জন্য তাঁরা উপরোক্ত সবকিছু করেছেন। আল্লাহ্‌কে সাহায্য করার অর্থ তাঁর দীনকে সাহায্য করা। এ ক্ষেত্রে তাঁদের ত্যাগ ও তিতিক্ষা বিস্ময়কর।

তাঁদের চতুর্থ গুণ হচ্ছে أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ — অর্থাৎ তাঁরাই কথা ও কাজে সত্যবাদী। ইসলামের কলেমা পাঠ করে তাঁরা আল্লাহ্ ও রসূলের সাথে যে অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়েছিলেন, তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। এই আয়াত সকল মুহাজির সাহাবী সত্যবাদী বলে দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছে। অতএব, যে ব্যক্তি তাঁদের কাউকে মিথ্যাবাদী বলে, সে এই আয়াত অস্বীকার করার কারণে মুসলমান হতে পারে না। নাউযুবিল্লাহ্! রাফেযী সম্প্রদায় তাঁদেরকে মুনাফিক আখ্যা দেয়। এটা এই আয়াতের সুস্পষ্ট লংঘন। রসূলে করীম (সা) এই ফকীর মুহাজিরগণের ওসীলা দিয়ে আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করতেন। এতেই বোঝা যায় যে, হুযুরের কাছে তাঁদের কি মর্যাদা ছিল।---(মাযহারী)

আনসারগণের শ্রেষ্ঠত্ব ঃ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ

تَبَوُّء শব্দের অর্থ অবস্থান গ্রহণ করা। دار বলে হিজরতের স্থান তথা মদীনা তাইয়েবা বোঝানো হয়েছে। এ কারণেই হযরত ইমাম মালিক (র) মদীনাকে দুনিয়ার সকল শহর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলতেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, দুনিয়ার যেসব শহরে ইসলাম পৌঁছেছে ও প্রসার লাভ করেছে, সেগুলো জিহাদের মাধ্যমে বিজিত হয়েছে ; এমনকি, মক্কা মোকাররমাও। একমাত্র মদীনা শহরই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ঈমান ও ইসলামকে বুকে ধারণ করেছে।---(কুরতুবী)

আয়াতে تَبَوَّءُوا ক্রিয়াপদের পর دار এর সাথে ঈমানও উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ অবস্থান গ্রহণ কোন স্থান ও জায়গায় হতে পারে। ঈমান কোন জায়গা নয় যে, এতে অবস্থান গ্রহণ করা হবে। তাই কেউ কেউ বলেন ঃ এখানে خلصوا অথবা تمكنوا ক্রিয়াপদ উহ্য আছে। উদ্দেশ্য এই যে, তাঁরা মদীনায় অবস্থান গ্রহণ করেছেন, ঈমানে খাঁটি ও পাকাপোক্ত হয়েছেন। এখানে এরূপও হতে পারে যে, ঈমানকে রূপক ভঙ্গিতে জায়গা ধরে নিয়ে তাতে অবস্থান গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। مِن قَبْلِهِمْ অর্থাৎ মুহাজিরগণের পূর্বে। এতে আনসারগণের একটি শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। তা এই যে, যে শহর আল্লাহ্‌র কাছে 'দারুল-হিজরত' ও 'দারুল-ঈমান' হওয়ার ছিল, তাতে তাঁদের অবস্থান ও বসতি মুহাজিরগণের পূর্বেই ছিল। মুহাজিরগণের এখানে স্থানান্তরিত হওয়ার পূর্বেই তাঁরা ঈমান কবূল করে পাকাপোক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। আনসারগণের দ্বিতীয় গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ অর্থাৎ তাঁরা তাদেরকে ভালবাসেন

যারা হিজরত করে তাঁদের শহরে আগমন করেছেন। এটা দুনিয়ার সাধারণ মানুষের রুচির পরিপন্থী। সাধারণত লোকেরা এহেন ভিটা-মাটিহীন দুর্গত মানুষকে স্থান দেওয়া পছন্দ করে না। সর্বত্রই দেশী ও ভিনদেশীর প্রশ্ন উঠে। কিন্তু আনসারগণ কেবল তাঁদেরকে স্থানই দেন নি, বরং নিজ নিজ গৃহে আবাদ করেছেন, নিজেদের ধনসম্পদে অংশীদার করেছেন এবং অভাবনীয় ইয্যত ও সম্ভ্রমের সাথে তাঁদেরকে স্বাগত জানিয়েছেন। এক একজন মুহাজিরকে জায়গা দেওয়ার জন্য এক সাথে কয়েকজন আনসারী আবেদন করেছেন। ফলে শেষ পর্যন্ত লটারীর মাধ্যমেও এর নিষ্পত্তি করতে হয়েছে।---(মাযহারী)

তাঁদের তৃতীয় গুণ এই বর্ণিত হয়েছে ঃ وَلَا يَجِدُوْنَ فِىْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً

مِّمَّا اُوْتُوْا এই বাক্যের সম্পর্ক একটি বিশেষ ঘটনার সাথে, যা বনূ নুযায়েরের নির্বাসন এবং তাদের বাগান ও গৃহের উপর মুসলমানদের দখল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় সংঘটিত হয়েছিল।

বনূ নুযায়েরের ধনসম্পদ বণ্টনের ঘটনা ঃ যে সময় বনূ নুযায়ের গোত্রের ফায়-এর ধনসম্পদ মুসলমানদের মধ্যে বন্টনের ইখতিয়ার রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেওয়া হয়, তখন মুহাজিরগণ ছিলেন সম্পূর্ণ নিঃস্ব। তাঁদের না ছিল নিজস্ব কোন বাড়ী-ঘর এবং না ছিল বিষয়-সম্পত্তি। তাঁরা আনসারগণের গৃহে বাস করতেন এবং তাঁদেরই বিষয়-সম্পত্তিতে মেহনত মজদুরি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। ফায়-এর সম্পদ হস্তগত হওয়ার পর রসূলুল্লাহ্ (সা) আনসারগণের সর্দার সাবেত ইবনে কায়স (রা)-কে ডেকে বললেন ঃ তুমি আনসারগণকে আমার কাছে ডেকে আন। সাবেত জিজ্ঞাসা করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্! আমার নিজের গোত্র খাযরাজের আনসারগণকে ডাকব, না সব আনসারকে ডাকব? রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ না, সবাইকে ডাকতে হবে। অতঃপর তিনি আনসারগণের এক সম্মেলনে ভাষণ দিলেন। হামদ ও সালাতের পর তিনি মদীনার আনসারগণের ভূয়সী প্রশংসা করে বললেন ঃ আপনারা আপনাদের মুহাজির ভাইদের সাথে যে ব্যবহার করেছেন, তা নিঃসন্দেহে অনন্য সাধারণ সাহসিকতার কাজ। অতঃপর তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বনূ নুযায়েরের ধনসম্পদ আপনাদের করতলগত করে দিয়েছেন। যদি আপনারা চান, তবে আমি এই সম্পদ মুহাজির ও আনসার সবার মধ্যে বন্টন করে দেব এবং মুহাজিরগণ পূর্ববৎ আপনাদের গৃহেই বসবাস করবে। পক্ষান্তরে আপনারা চাইলে আমি এই সম্পদ কেবল গৃহহীন ও সহায়-সম্বলহীন মুহাজিরগণের মধ্যেই বণ্টন করে দেব এবং এরপর তারা আপনাদের গৃহ ত্যাগ করে আলাদা নিজেদের গৃহ নির্মাণ করে নেবে।

এই বক্তৃতা শুনে আনসারগণের দুই জন প্রধান নেতা সা'দ ইবনে ওবাদা (রা) ও সা'দ ইবনে মুয়ায (রা) দণ্ডায়মান হলেন এবং আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলুল্লাহ্ (সা)! আমাদের অভিমত এই যে, এই ধনসম্পদ আপনি সম্পূর্ণই কেবল মুহাজির ভাইদের মধ্যে বন্টন করে দিন এবং তাঁরা এরপরও পূর্ববৎ আমাদের গৃহে বসবাস করুন। নেতাদ্বয়ের এই উক্তি

শুনে উপস্থিত আনসারগণ সমস্বরে বলে উঠলেন : আমরা এই সিদ্ধান্তে সম্মত ও আনন্দিত। তখন রসূলুল্লাহ্ (সা) সকল আনসার ও তাঁদের সন্তানগণকে দোয়া দিলেন এবং ধনসম্পদ মুহাজিরগণের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন। আনসারগণের মধ্যে মাত্র দুই ব্যক্তি অর্থাৎ সহল ইবনে হানীফ ও আবু দুজানাকে অত্যধিক অভাবগ্রস্ততার কারণে অংশ দিলেন। গোত্রনেতা সা'দ ইবনে মুয়ায (রা)-কে ইবনে আবী হাকীকের একটি বিখ্যাত তরবারি প্রদান করা হল।---(মাযহারী)

উল্লিখিত আয়াতে حَاجَةً বলে প্রয়োজনের বস্তু এবং مِمَّا أُوتُوا এর সর্বনাম দ্বারা মুহাজিরগণকে বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, এই বণ্টনে যা কিছু মুজাহিরগণকে দেওয়া হল, মদীনার আনসারগণ সানন্দে তা গ্রহণ করে নিলেন; যেন তাঁদের এসব জিনিসের কোন প্রয়োজনই ছিল না। মুহাজিরগণকে দেওয়াকে খারাপ মনে করা অথবা অভিযোগ করার তো সামান্যতম কোন সম্ভাবনাই ছিল না। এর মুকাবিলায় যখন বাহ-রাইন বিজিত হল, তখন রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রাপ্ত ধনসম্পদ সম্পূর্ণই আনসারগণের মধ্যে বিলিবণ্টন করে দিতে চাইলেন; কিন্তু তাঁরা তাতে রাযী হলেন না, বরং বললেন : আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত কিছুই গ্রহণ করব না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের মুহাজির ভাইগণকেও এই ধনসম্পদ থেকে অংশ না দেওয়া হয়।---(বুখারী, ইবনে কাসীর)

আনসারগণের চতুর্থ গুণ এই আয়াতে বর্ণিত হয়েছে : وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ — خَصَاصَةٌ শব্দের অর্থ দারিদ্র্য ও উপবাস। إِيثَار-এর অর্থ অপরের বাসনা ও প্রয়োজনকে নিজের বাসনা ও প্রয়োজনের অগ্রে রাখা। আয়াতের অর্থ এই যে, আনসারগণ নিজেদের উপর মুহাজিরগণকে অগ্রাধিকার দিতেন। নিজেদের প্রয়োজন মেটানোর আগে তাঁদের প্রয়োজন মেটাতেন; যদিও নিজেরাও অভাবগ্রস্ত ও দারিদ্র্য-প্রপীড়িত ছিলেন।

সাহাবীগণের, বিশেষত আনসারগণের আত্মত্যাগের কয়েকটি ঘটনা : আয়াতের তফসীরের জন্য ঘটনাবলী বর্ণনা করা জরুরী নয়, কিন্তু এসব ঘটনা মানুষকে উৎকৃষ্ট মানবতা শিক্ষা দেয় এবং জীবনে বিপ্লব আনয়ন করে। তাই তফসীরবিদগণ এ স্থলে এসব ঘটনা বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন। এখানে তফসীরে কুরতুবী থেকে কয়েকটি ঘটনা উদ্ধৃত করা হল।

তিরমিযীতে হযরত আবু হুরায়রা (রা)-র রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণিত আছে, জনৈক আনসারীর গৃহে রাত্রিবেলায় একজন মেহমান আগমন করল। তাঁর কাছে এই পরিমাণ খাদ্য ছিল, যা তিনি নিজে এবং তাঁর সন্তানগণ খেতে পারেন। তিনি স্ত্রীকে বললেন : বাচ্চাদেরকে কোনরূপে শুইয়ে দাও। অতঃপর বাতি নিভিয়ে দিয়ে মেহমানের সামনে

আহার্য রেখে কাছাকাছি বসে যাও, যাতে মেহমান মনে করে যে, আমরাও খাচ্ছি ; কিন্তু আসলে আমরা খাব না। এভাবে মেহমান পেট ভরে খেতে পারবে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে يُؤْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ আয়াতখানি নাযিল হয়।

তিরমিযীতেই হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে আরো একটি ঘটনা বর্ণিত যে, জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে উপস্থিত হয়ে আরয করল ঃ আমি ক্ষুধায় অতিষ্ঠ। তিনি একজন বিবির কাছে সংবাদ দিলে জওয়াব আসল ঃ আমার কাছে এক্ষণে পানি ব্যতীত কিছুই নেই। অন্য একজন বিবির কাছে সংবাদ দিলে সেখানে থেকেও তাই জওয়াব আসল। অতঃপর তৃতীয়, চতুর্থ এমনকি, সকল বিবির কাছে খোঁজ নেওয়া হলে সবার কাছ থেকে একই জওয়াব পাওয়া গেল যে, পানি ব্যতীত গৃহে কিছুই নেই। অগত্যা রসূলুল্লাহ্ (সা) উপস্থিত সাহাবীগণকে সম্বোধন করে বললেন ঃ কে আছ, যে এই ব্যক্তিকে আজ রাত অতিথি করে নেবে ? জনৈক আনসারী আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলুল্লাহ্ ! আমি করব। অতঃপর তিনি লোকটিকে সাথে নিয়ে গেলেন এবং গৃহে পৌঁছে স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ কিছু খাবার আছে কি ? উত্তর হল ঃ আমাদের বাচ্চারা খেতে পারে, এই পরিমাণ খাদ্য আছে। আনসারী বললেন ঃ বাচ্চাদেরকে শুইয়ে দাও। অতঃপর মেহমানের সামনে খাবার রেখে আমরাও সাথে বসে যাব। এরপর বাতি নিভিয়ে দেবে, যাতে মেহমান আমাদের না খাওয়ার বিষয় জানতে না পারে। সেমতে মেহমান আহার করল। সকালে আনসারী রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে উপস্থিত হলে তিনি বললেন ঃ গতরাতে তুমি মেহমানের সাথে যে ব্যবহার করেছ, তা আল্লাহ্ তা'আলা অত্যধিক পছন্দ করেছেন।

মেহদভী হযরত সাবেত ইবনে কায়সের সাথে জনৈক আনসারীর এমনি ধরনের একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। রেওয়ায়েতে প্রত্যেক ঘটনার সাথে একথাও বর্ণিত হয়েছে যে, এই আয়াত এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে।

কুশায়রী হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, জনৈক মান্যবর সাহাবীর কাছে এক ব্যক্তি একটি বকরীর মাথা উপঢৌকন পেশ করেন। সাহাবী মনে করলেন আমার অমুক ভাই ও তাঁর বাচ্চারা আমার চাইতে বেশী অভাবগ্রস্ত। সেমতে তিনি মাথাটি তার কাছে এবং তৃতীয় জন চতুর্থ জনের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তিনিও এমনি-ভাবে তৃতীয় জনের কাছে এবং তৃতীয় জন চতুর্থ জনের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। অবশেষে সাতটি গৃহে যাওয়ার পর মাথাটি আবার প্রথম সাহাবীর গৃহে ফিরে এল। এই ঘটনার পরি-প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। সা'লাবী হযরত আনাস (রা) থেকেও এই ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

মুয়াত্তা ইমাম মালিকে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি হযরত আয়েশা (রা)-র কাছে কিছু চাইল। তাঁর গৃহে তখন একটি মাত্র রুটি ছিল এবং তিনি সেদিন রোযা রেখেছিলেন। তিনি পরিচারিকাকে বললেন ঃ এই রুটি তাকে দিয়ে দাও। পরিচারিকা বলল ঃ এই রুটি দিয়ে দিলে আপনার ইফতার করার কিছু থাকবে না। হযরত আয়েশা (রা) বললেন ঃ না থাক, তুমি দিয়ে দাও। পরিচারিকা বর্ণনা করে---যখন সন্ধ্যা হল, তখন উপঢৌকন

প্রেরণে অভ্যস্ত নয়---এমন এক ব্যক্তি হযরত আয়েশার কাছে একটি আস্ত ভাজা করা বকরী উপঢৌকন হিসাবে প্রেরণ করল। তার উপর ময়দার আটার আবরণী ছিল। আরবে একে সর্বোত্তম খাদ্য মনে করা হত। হযরত আয়েশা (রা) পরিচারিকাকে ডেকে বললেন ঃ খাও, এটা তোমার সেই রুটি থেকে উত্তম।

নাসায়ী বর্ণনা করেন, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর অসুস্থ অবস্থায় আঙুর খাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলে এক দিরহামের বিনিময়ে এক গুচ্ছ আঙুর কিনে আনা হয়। ঘটনাক্রমে তখন এক মিসকীন এসে উপস্থিত হল এবং কিছু চাইল। অসুস্থ ইবনে ওমর বললেন ঃ আঙুরের গুচ্ছটি তাকে দিয়ে দাও। উপস্থিত লোকদের মধ্যে এক ব্যক্তি গোপনে মিসকীনের পেছনে পেছনে গেল এবং গুচ্ছটি তার কাছ থেকে কিনে হযরত ইবনে ওমরের সামনে পেশ করল। কিন্তু ভিক্ষুকটি আবার আসল এবং কিছু চাইল। হযরত ইবনে ওমর পুনরায় গুচ্ছটি তাকে দিয়ে দিলেন। আবার এক ব্যক্তি গোপনে ভিক্ষুকের পেছনে পেছনে যেয়ে এক দিরহামের বিনিময়ে গুচ্ছটি কিনে আনল এবং হযরত ইবনে ওমরের কাছে পেশ করল। ভিক্ষুকটি আবার ধরনা দিতে চাইলে সবাই তাকে নিষেধ করল। হযরত ইবনে ওমর যদি জানতে পারতেন যে, এটা সেই সদকায় দেওয়া গুচ্ছ, তবে কিছুতেই তা খেতেন না। কিন্তু তিনি বাজার থেকে আনা হয়েছে ভেবে তা ব্যবহার করলেন।

ইবনে মুবারক নিজ সনদে বর্ণনা করেন, একবার খলীফা উমর ফারূক (রা) একটি থলিয়ায় চার শ' দীনার ভরে থলিয়াটি চাকরের হাতে দিয়ে বললেন ঃ এটি আবূ ওবায়দা ইবনে জাররাহের কাছে নিয়ে যাও এবং বল ঃ খলীফার পক্ষ থেকে এই হাদিয়া কবূল করে নিজের প্রয়োজনে ব্যয় করুন। তিনি চাকরকে আরও বলে দিলেন ঃ হাদিয়া পেশ করার পর তুমি কিছুক্ষণ দেরী করবে এবং দেখবে যে, আবূ ওবায়দা কি করেন। চাকর নির্দেশ অনুযায়ী থলিয়াটি হযরত আবূ ওবায়দা (রা)-র কাছে পেশ করে কিছুক্ষণ দেরী করল। আবূ ওবায়দা (রা) থলিয়া হাতে নিয়ে দোয়া করলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ওমরের প্রতি রহম করুন এবং তাকে উত্তম বিনিময় দিন। তিনি তৎক্ষণাৎ দাসীকে ডেকে বললেন ঃ নাও, এই সাত অমুককে এবং পাঁচ অমুককে দিয়ে এস। এভাবে গোটা চার শ' দীনার তিনি তখনই বণ্টন করে দিলেন।

চাকর ফিরে এসে ঘটনা বর্ণনা করল। হযরত উমর (রা) এমনিভাবে আরও চার শ' দীনার অপর একটি থলিয়ায় ভর্তি করে চাকরের হাতে দিয়ে বললেন ঃ এটি মুয়ায ইবনে জবলকে দিয়ে এস এবং কিছুক্ষণ দেরী করে লক্ষ্য কর তিনি কি করেন। চাকর নিয়ে গেল। হযরত মুয়ায ইবনে জবল থলিয়া হাতে নিয়ে হযরত উমর (রা)-র জন্য দোয়া করলেন। তিনিও থলিয়া খুলে কালবিলম্ব না করে বণ্টনে বসে গেলেন। তিনি দীনারগুলো অনেক ভাগে ভাগ করে বিভিন্ন গৃহে প্রেরণ করতে লাগলেন। তাঁর স্ত্রী ব্যাপার দেখে যাচ্ছিলেন। অবশেষে বললেন ঃ আমিও তো মিসকীনই। আমাকেও কিছু দিন না কেন? তখন থলিয়াতে মাত্র দু'টি দীনার অবশিষ্ট ছিল। সেমতে তাই তাঁকে দিয়ে দিলেন। চাকর এই দৃশ্য দেখে ফিরে এল এবং খলীফার কাছে বর্ণনা করল। খলীফা বললেন ঃ এরা সবাই ভাই ভাই। সবার স্বভাব একই রূপ।

হুযায়ফা আদভী বলেন ঃ আমি ইয়ারমুক যুদ্ধে আমার চাচাত ভাইয়ের খোঁজে শহীদদের লাশ দেখার জন্য বের হলাম। সাথে কিছু পানি নিলাম, যাতে তার মধ্যে প্রাণের স্পন্দন দেখলে পান করিয়ে দিতে পারি। তার নিকটে পৌঁছে দেখলাম যে, প্রাণের স্পন্দন এখনও নিঃশেষ হয়নি। আমি বললাম ঃ আপনাকে পানি পান করাব কি? তিনি ইঙ্গিতে 'হ্যাঁ' বললেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ কাছে থেকে অন্য একজন শহীদের আহ্ আহ্ শব্দ কানে এল। আমার ভাই বললেন ঃ এই পানি তাকে দিয়ে দাও। আমি তার কাছে পৌঁছে পানি দিতে চাইলে তৃতীয় একজনের কাতরানোর আওয়াজ কানে এল। সে-ও এই তৃতীয়জনকে পানি দিয়ে দিতে বলল। এমনিভাবে একের পর এক করে সাতজন শহীদের সাথে একই ঘটনা সংঘটিত হল। আমি যখন সপ্তম শহীদের কাছে গেলাম, তখন সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিল। সেখান থেকে আমি আমার ভাইয়ের কাছে এসে দেখি তিনিও খতম হয়ে গেছেন।

কিছু আনসারগণের এবং কিছু মুহাজিরগণের মিলিয়ে এই কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা হল। অধিকাংশ ঘটনা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, আলোচ্য আয়াত এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে। এতে কোন বৈপরীত্য ও বিরোধ নেই। কারণ, যে ধরনের ঘটনা সম্পর্কে আয়াত অবতীর্ণ হয় যদি সেই ধরনের অন্য কোন ঘটনা সংঘটিত হয়ে যায়, তবে বলে দেওয়া হয় যে, এই ঘটনা সম্পর্কে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে। প্রকৃত সত্য এই যে, সবগুলো ঘটনাই আয়াত অবতরণের কারণ।

একটি সন্দেহ নিরসন ঃ সাহাবায়ে কিরামের উপরোক্ত আত্মত্যাগের ঘটনাবলী সম্পর্কে হাদীসদৃষ্টে একটি সন্দেহ দেখা দেয়। তা এই যে, রসূলে করীম (সা) মুসলমানগণকে তাদের সম্পূর্ণ ধনসম্পদ সদকা করতে নিষেধ করেছেন। এক হাদীসে আছে জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সামনে একটি ডিম্ব পরিমাণ স্বর্ণের টুকরা সদকার জন্য পেশ করলে তিনি তা লোকটির দিকে নিক্ষেপ করে বললেন ঃ তোমাদের কেউ কেউ তার যথাসর্বস্ব সদকা করার জন্য নিয়ে আসে। এরপর অভাবগ্রস্ত হয়ে মানুষের কাছে ভিক্ষার হাত পাতে।

এসব রেওয়ায়েত থেকেই এই সন্দেহের জওয়াব পাওয়া যায় যে, মানুষের অবস্থা বিভিন্ন রূপ হয়ে থাকে। প্রত্যেক অবস্থার জন্য আলাদা বিধানও হয়ে থাকে। সম্পূর্ণ ধনসম্পদ দান করার নিষেধাজ্ঞা তাদের জন্য, যারা পরবর্তী সময়ে দারিদ্র্য ও উপবাস দেখা দিলে সবর করতে সক্ষম নয় এবং কৃতদানের জন্য আফসোস করে অথবা মানুষের কাছে ভিক্ষার হাত প্রসারিত করতে বাধ্য হয়। পক্ষান্তরে যারা অসম সাহসিক ও দৃঢ়চেতা, সবকিছু ব্যয় করার পর দারিদ্র্য ও উপবাসের কারণে পেরেশান হয় না; বরং সাহসিকতার সাথে সবর করতে সক্ষম, তাদের জন্য সমস্ত ধনসম্পদ আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে দেওয়া জায়েয। উদাহরণত এক জিহাদের সময় হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) তাঁর যথাসর্বস্ব চাঁদা হিসাবে পেশ করে দিয়েছিলেন। উপরোক্ত ঘটনাবলী এরই নযীর। এহেন দৃঢ়চেতা লোকগণ তাঁদের সন্তান-সন্ততিকেও সবর ও দৃঢ়তায় অভ্যস্ত করে রেখেছিলেন। ফলে এতে তাদেরও কোন অধিকার ক্ষুণ্ণ হত না। স্বয়ং সন্তানদের হাতে ধনসম্পদ থাকলে তারাও তাই করত।---(কুরতুবী)

মুহাজিরগণের পক্ষ থেকে আনসারগণের ত্যাগের বিনিময়ঃ দুনিয়াতে কোন সংঘবদ্ধ মহতী উদ্যোগ একতরফা উদারতা ও আত্মত্যাগ দ্বারা কায়েম থাকতে পারে না, যে পর্যন্ত উভয় পক্ষ থেকে এমনি ধরনের ব্যবহার না হয়। এ কারণেই রসূলুল্লাহ্ (সা) যেমন মুসলমানদেরকে পরস্পরে উপঢৌকন আদান-প্রদান করে পারস্পরিক সম্প্রীতি বৃদ্ধিতে উৎসাহিত করেছেন, তেমনি যাকে উপঢৌকন দেওয়া হয়, তাকেও উপঢৌকন দাতার অনুগ্রহের প্রতিদান দেওয়ার শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি বলেছেনঃ যদি আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য থাকে, তবে আর্থিক প্রতিদান, নতুবা দোয়ার মাধ্যমেই তার অনুগ্রহের বিনিময় দান কর। অর্বাচীনের ন্যায় কারও অনুগ্রহের বোঝা মাথায় নিতে থাকা ভদ্রতা ও সাধু চরিত্রের পরিপন্থী।

মুহাজিরগণের ব্যাপারে আনসারগণ অপূর্ব আত্মত্যাগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছিলেন। নিজেদের গৃহে, দোকানে, কাজ-কারবারে ও শস্যক্ষেত্রে তাঁদেরকে অংশীদার করে নিয়েছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা যখন মুহাজিরগণকে সচ্ছলতা দান করলেন তখন তাঁরাও আনসারগণের অনুগ্রহের যথোপযুক্ত প্রতিদান দিতে কার্পণ্য করেন নি।

কুরতুবী হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন, মুহাজিরগণ যখন মদীনায় আগমন করেন, তখন তাঁরা সম্পূর্ণ রিক্তহস্ত ছিলেন এবং মদীনার আনসারগণ বিষয়সম্পত্তির মালিক ছিলেন। আনসারগণ তাঁদেরকে সব বস্তুই অর্ধেক অর্ধেক ভাগ করে দেন এবং বাগানের অর্ধেক ফল বাৎসরিক তাঁদেরকে দিতে থাকেন। হযরত আনাস (রা)-এর জননী উম্মে সুলায়ম নিজের কয়েকটি খর্জুর বৃক্ষ রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দিয়েছিলেন। তিনি তা উসামা ইবনে যায়দের জননী উম্মে আয়মনকে দান করে দেন।

ইমাম যুহরী বলেনঃ আমাকে হযরত আনাস (রা) জানিয়েছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন খায়বর যুদ্ধ থেকে বিজয়ীবেশে মদীনা প্রত্যাবর্তন করেন, তখন প্রচুর পরিমাণে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ মুসলমানগণ লাভ করেন। এ সময় সকল মুহাজিরই আনসারগণের দান হিসাব করে তাঁদেরকে প্রত্যর্পণ করেন এবং রসূলুল্লাহ্ (সা) আমার জননীর খর্জুর বৃক্ষ উম্মে আয়মনের কাছ থেকে নিয়ে আমার জননীর হাতে প্রত্যর্পণ করেন। উম্মে আয়মনকে এর পরিবর্তে নিজের বাগান থেকে বৃক্ষ দিলেন।

وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ — আনসারগণের আত্মত্যাগ ও আল্লাহ্র পথে সবকিছু বিসর্জন দেওয়ার কথা বর্ণনা করার পর সাধারণ বিধি হিসাবে বলা হয়েছে যে, যারা মনের কার্পণ্য থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে, তারাই আল্লাহ্র কাছে সফলকাম। بُخْل ও شُحّ শব্দদ্বয় প্রায় সমার্থবোধক। তবে شُحّ শব্দের মধ্যে কিঞ্চিৎ আতিশয্য আছে। ফলে এর অর্থ অতিশয় কৃপণতা। যাকাত, ফিতরা, ওশর, কুরবানী ইত্যাদি আল্লাহ্র ওয়াজিব হক আদায়ে অথবা সন্তান-সন্ততির ভরণ-পোষণ, অভাবগ্রস্ত পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের ভরণ-পোষণ ইত্যাদি বান্দার ওয়াজিব হক আদায়ে কৃপণতা করা হলে তা নিশ্চিতরূপে হারাম। যে কৃপণতা মুস্তাহাব বিষয় ও দান খয়রাতের ফযীলত অর্জনে প্রতিবন্ধক হয়, তা মকরূহ ও নিন্দনীয় এবং যা প্রথাগত কাজে প্রতিবন্ধক হয়, তা শরীয়তের আইনে কৃপণতা নয়।

কার্পণ্য ও পরশ্রীকাতরতা খুবই নিন্দনীয় অভ্যাস। কোরআন ও হাদীসে জোরালো ভাষায় এসবের নিন্দা করা হয়েছে এবং যারা এসব বিষয় থেকে মুক্ত, তাদের জন্য সুসংবাদ বর্ণনা করা হয়েছে। উপরে আনসারগণের যে গুণাবলী উল্লিখিত হয়েছে, তা থেকে পরিস্কার বোঝা যায় যে তাঁরা কার্পণ্য ও পরশ্রীকাতরতা থেকে মুক্ত ছিলেন।

হিংসা-বিদ্বেষ থেকে পবিত্র হওয়া জান্নাতী হওয়ার আলামত ঃ ইমাম আহ্‌মদ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন ঃ

> আমরা একদিন রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাথে উপবিষ্ট ছিলাম। তিনি বললেন ঃ এক্ষণি তোমাদের সামনে একজন জান্নাতী ব্যক্তি আগমন করবে। সেমতে কিছুক্ষণ পরই জনৈক আনসারী আগমন করলেন। তাঁর দাড়ি থেকে ওযূর পানি টপকে পড়ছিল এবং তাঁর বাম হাতে জুতা জোড়া ছিল। দ্বিতীয় দিনও এমনি ঘটনা ঘটল এবং সেই ব্যক্তি একই অবস্থায় আগমন করলেন। তৃতীয় দিনও তাই হল এবং এই ব্যক্তি উল্লিখিত অবস্থায় প্রবেশ করলেন। এ দিন রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মজলিস ত্যাগ করলেন, তখন হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে আস (রা) এই ব্যক্তির পেছনে লাগলেন (যাতে তাঁর জান্নাতী হওয়ার ভেদ জানতে পারেন)। তিনি আনসারীকে বললেন ঃ পারিবারিক কলহের কারণে আমি প্রতিজ্ঞা করেছি যে, তিন দিন নিজের গৃহে যাব না। আপনি যদি অসুবিধা মনে না করেন, তবে তিন দিন আমাকে নিজের বাড়ীতে থাকতে দিন। আনসারী সানন্দে এই প্রস্তাব মঞ্জুর করলেন। আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর তিন রাত্রি তাঁর বাড়ীতে অতিবাহিত করলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন যে, আনসারী রাত্রিতে তাহাজ্জুদের জন্য 'গাত্রোত্থান' করেন না। তবে নিদ্রার জন্য শয্যা গ্রহণের পূর্বে কিছু আল্লাহ্‌র যিকির করেন। এরপর ফজরের নামাযের জন্য উঠেন। আবদুল্লাহ ইবনে আমর বলেন ঃ তবে এই সময়ের মধ্যে আমি তাঁর মুখে ভাল কথা ছাড়া কিছু শুনিনি। এভাবে তিন রাত্রি কেটে গেল। আমার অন্তরে যখন তাঁর আমল সম্পর্কে তাচ্ছিল্যের ভাব বদ্ধমূল হওয়ার উপক্রম হল, তখন আমি তাঁর কাছে আমার আগমনের আসল উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে দিলাম এবং বললাম ঃ আমার গৃহে কোন কলহ-বিবাদ ছিল না। কিন্তু আমি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মুখে তিন দিন পর্যন্ত শুনলাম যে, তোমাদের কাছে এখন একজন জান্নাতী ব্যক্তি আগমন করবে। এরপর তিন দিনই আপনি আসলেন। তাই আমার ইচ্ছা হল যে, আপনার সাথে থেকে দেখব কি আমলের কারণে আপনি এই ফযীলত অর্জন করলেন! কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আমি আপনাকে কোন বড় আমল করতে দেখলাম না। অতএব, কি বিষয়ের দরুন আপনি এই স্তরে উন্নীত হয়েছেন? তিনি বললেন ঃ আপনি যা দেখলেন, এছাড়া আমার কাছে অন্য কোন আমল নেই। আমি একথা শুনে প্রস্থানোদ্যত হলে তিনি আমাকে ডেকে নিয়ে বললেন ঃ হ্যাঁ, একটি বিষয় আছে। তা এই যে, আমি আমার অন্তরে কোন মুসলমানদের প্রতি জিঘাংসা ও কুধারণা খুঁজে পাই না এবং এমন কারও প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করি না, যাকে আল্লাহ্ তা'আলা কোন কল্যাণ দান করেছেন। আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর (রা) বলেন ঃ ব্যস, এ গুণটিই আপনাকে এই উচ্চ মর্যাদায় আসীন করেছে।

ইবনে কাসীর এই রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করে বলেন : ইমাম নাসায়ীও 'আমলুল ইয়াওমি ওয়াল্লাইলাহ্' অধ্যায়ে এটি বর্ণনা করেছেন এবং এর সনদ বুখারী ও মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী সহীহ্।

মুহাজির ও আনসারগণের পর উম্মতের সাধারণ মুসলমান : وَالَّذِيْنَ جَاءُوْا

مِنْۢ بَعْدِهِمْ এই আয়াতের অর্থে সাহাবায়ে কিরাম মুহাজির ও আনসারগণের পরে কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সকল মুসলমান শামিল আছে এবং এই আয়াত তাদের সবাই-কে ফায়-এর মালে হকদার সাব্যস্ত করেছে। এ কারণেই খলীফা হযরত উমর ফারূক (রা) ইরাক, সিরিয়া, মিসর ইত্যাদি বড় বড় শহর অধিকার করার পর এদের সম্পত্তি যোদ্ধাদের মধ্যে বণ্টন করেন নি; বরং এগুলো ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য সাধারণ ওয়াক্ফ হিসাবে রেখে দিয়েছেন, যাতে এসব সম্পত্তির আমদানী ইসলামী বায়তুলমালে জমা হয় এবং তা দ্বারা কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী মুসলমানগণ উপকৃত হয়। কোন কোন সাহাবী তাঁর কাছে বিজিত সম্পত্তি বণ্টন করে দেওয়ার আবেদন করলে তিনি এই আয়াতের বরাত দিয়ে জওয়াব দেন যে, আমার সামনে ভবিষ্যৎ বংশধরদের প্রশ্ন না থাকলে আমি যে দেশই অধিকার করতাম, তার সম্পত্তি যোদ্ধাদের মধ্যে বণ্টন করে দিতাম; যেমন রসূ-লুল্লাহ্ (সা) খায়বরের সম্পত্তি বণ্টন করে দিয়েছিলেন। এসব সম্পত্তি বর্তমান মুসলমানদের মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে গেলে ভবিষ্যৎ মুসলমানদের জন্য কি অবশিষ্ট থাকবে? ---(মালিক, কুরতুবী)

সাহাবায়ে কিরামের ভালবাসা ও মাহাত্ম্য অন্তরে পোষণ করা মুসলমানদের সত্যপন্থী হওয়ার পরিচায়ক : এ স্থলে আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র উম্মতে মুহাম্মদীকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন---মুহাজির, আনসার ও অবশিষ্ট সাধারণ মুসলমান। মুহাজির ও আনসারগণের বিশেষ গুণাবলী ও শ্রেষ্ঠত্বও এ স্থলে উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু সাধারণ মুসলমানগণের শ্রেষ্ঠত্ব ও গুণাবলীর মধ্য থেকে মাত্র একটি বিষয় এই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা সাহাবায়ে কিরামের ঈমানে অগ্রগামিতা এবং তাদের কাছে ঈমান পৌঁছানোর মাধ্যম হওয়ার গুণটিকে সম্যক বুঝে এবং সবার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করে। এছাড়া নিজেদের জন্যও এরূপ দোয়া করে : আল্লাহ্ আমাদের অন্তরে কোন মুসলমানের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ রেখো না।

এ থেকে জানা গেল যে, সাহাবায়ে কিরামের পরবর্তী মুসলমানদের ঈমান ও ইস-লাম কবূল হওয়ার শর্ত হচ্ছে সাহাবায়ে কিরামের মাহাত্ম্য ও ভালবাসা অন্তরে পোষণ করা এবং তাঁদের জন্য দোয়া করা। যার মধ্যে এই শর্ত অনুপস্থিত, সে মুসলমান কথিত হওয়ার যোগ্য নয়। এ কারণেই হযরত মুসাব ইবনে সা'দ (রা) বলেন : উম্মতের সকল মুসলমান তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। তাদের মধ্যে দুই শ্রেণী অতিক্রান্ত হয়ে গেছে অর্থাৎ মুহাজির ও আনসার। এখন সাহাবায়ে কিরামের প্রতি মহব্বত পোষণকারী এক শ্রেণী বাকী

রয়ে গেছে। তোমরা যদি উম্মতের মধ্যে কোন আসন কামনা কর, তবে এই তৃতীয় শ্রেণীতে দাখিল হয়ে যাও।

হযরত হুসাইন (রা)-কে জনৈক ব্যক্তি হযরত ওসমান (রা) সম্পর্কে (তাঁর শাহাদাতের ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পর) প্রশ্ন করেছিল। তিনি পাল্টা প্রশ্নকারীকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ তুমি কি মুহাজিরগণের অন্তর্ভুক্ত? সে নেতিবাচক উত্তর দিল। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেনঃ তবে কি আনসারগণের একজন? সে বললঃ না। হযরত হুসাইন (রা) বললেনঃ এখন তৃতীয় আয়াত اَلَّذِيْنَ جَاءُوْا مِنْ بَعْدِهِمْ বাকী রয়ে গেছে। তুমি যদি হযরত ওসমান গনী (রা) সম্পর্কে জনমনে সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি করতে চাও, তবে এই তৃতীয় শ্রেণী থেকেও খারিজ হয়ে যাবে।

কুরতুবী বলেনঃ এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, সাহাবায়ে কিরামের প্রতি ভালবাসা রাখা আমাদের জন্য ওয়াজিব। ইমাম মালেক (র) বলেনঃ যে ব্যক্তি কোন সাহাবীকে মন্দ বলে অথবা তাঁর সম্পর্কে মন্দ বিশ্বাস রাখে, মুসলমানদের ফায়-এর মালে তাঁর কোন অংশ নেই। এর প্রমাণস্বরূপ তিনি আলোচ্য আয়াত পেশ করেন। যেহেতু ফায়-এর মালে প্রত্যেক মুসলমানের অংশ আছে, তাই যার অংশ বাদ পড়বে তার ইসলাম ও ঈমানই সন্দেহযুক্ত হয়ে যাবে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা সকল মুসলমানকে সাহাবায়ে কিরামের জন্য ইস্তিগফার ও দোয়া করার আদেশ দিয়েছেন। অথচ আল্লাহ্ জানতেন যে, তাঁদের পরস্পরে যুদ্ধ-বিগ্রহও হবে। তাই তাঁদের পারস্পরিক বাদানুবাদের কারণে তাঁদের মধ্য থেকে কারও প্রতি কুধারণা পোষণ করা কোন মুসলমানের জন্য জায়েয নয়।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) বলেনঃ আমি তোমাদের নবী (সা)-র মুখে শুনেছি--- এই উম্মত ততদিন ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে না, যতদিন তাদের পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদেরকে অভিশাপ ও ভর্ৎসনা না করে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা) বলেনঃ তুমি যদি কাউকে দেখ যে, কেউ কোন সাহাবীকে মন্দ বলছে, তবে তাকে বলঃ যে তোমাদের মধ্য থেকে অধিক মন্দ তার উপর আল্লাহ্র লানত হোক। বলা বাহুল্য, অধিক মন্দ সাহাবী হতে পারেন না---যে তাঁকে মন্দ বলে সে-ই হবে। সারকথা এই যে, সাহাবীদের মধ্য থেকে কাউকে মন্দ বলা লানতের কারণ।

আওয়াম ইবনে হাওশব বলেনঃ এই উম্মতের পূর্ববর্তিগণ মানুষকে সাহাবায়ে কিরামের শ্রেষ্ঠত্ব ও গুণাবলী বর্ণনা করতে উদ্বুদ্ধ করতেন, যাতে মানুষের অন্তরে তাঁদের ভালবাসা সৃষ্টি হয়। আমি এ ব্যাপারে তাঁদেরকে একনিষ্ঠভাবে ও দৃঢ়তার সাথে কাজ করতে দেখেছি। তাঁরা আরও বলতেনঃ সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে যে মতবিরোধ ও বাদানুবাদ সংঘটিত হয়েছে সেগুলো বর্ণনা করো না; করলে মানুষের ধৃষ্টতা বেড়ে যাবে। ---(কুরতুবী)

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ
أَهْلِ الْكِتٰبِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا
أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكٰذِبُونَ ۝١١
لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ
نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ ۝١٢ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً
فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللّٰهِ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ۝١٣ لَا
يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ
بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتّٰى ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ
لَا يَعْقِلُونَ ۝١٤ كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ
وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝١٥ كَمَثَلِ الشَّيْطٰنِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا
كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِينَ ۝١٦ فَكَانَ عَا
قِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذٰلِكَ جَزٰٓؤُا الظّٰلِمِينَ ۝١٧

(১১) আপনি কি মুনাফিকদেরকে দেখেন নি? তারা তাদের কিতাবধারী কাফির ভাইদেরকে বলে ঃ তোমরা যদি বহিষ্কৃত হও, তবে আমরা অবশ্যই তোমাদের সাথে দেশ থেকে বের হয়ে যাব এবং তোমাদের ব্যাপারে আমরা কখনও কারও কথা মানব না। আর যদি তোমরা আক্রান্ত হও; তবে আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে সাহায্য করব। আল্লাহ্ সাক্ষ্য দেন যে, তারা নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী। (১২) যদি তারা বহিষ্কৃত হয়, তবে মুনাফিকরা তাদের সাথে দেশত্যাগ করবে না আর যদি তারা আক্রান্ত হয়, তবে তারা তাদেরকে সাহায্য করবে না। যদি তাদেরকে সাহায্য করে, তবে অবশ্যই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করবে। এরপর কাফিররা কোন সাহায্য পাবে না। (১৩) নিশ্চয় তোমরা তাদের অন্তরে আল্লাহ্ অপেক্ষা অধিকতর ভয়াবহ। এটা এ কারণে যে, তারা এক নির্বোধ সম্প্রদায়। (১৪) তারা সংঘবদ্ধভাবেও তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারবে না। তারা যুদ্ধ করবে কেবল সুরক্ষিত জনপদে অথবা দুর্গ প্রাচীরের আড়ালে থেকে। তাদের পারস্পরিক যুদ্ধই প্রচণ্ড

হয়ে থাকে। আপনি তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ মনে করবেন; কিন্তু তাদের অন্তর শতধা বিচ্ছিন্ন। এটা এ কারণে যে, তারা এক কাণ্ডজ্ঞানহীন সম্প্রদায়। (১৫) তারা সেই লোকদের মত, যারা তাদের নিকট পূর্বে নিজেদের কর্মের শাস্তি ভোগ করেছে। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (১৬) তারা শয়তানের মত, যে মানুষকে কাফির হতে বলে। অতঃপর যখন সে কাফির হয়, তখন শয়তান বলে ঃ তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমি বিশ্বপালনকর্তা আল্লাহ্‌কে ভয় করি। (১৭) অতঃপর উভয়ের পরিণতি হবে এই যে, তারা জাহান্নামে যাবে এবং চিরকাল তথায় বসবাস করবে। এটাই জালিমদের শাস্তি।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি কি মুনাফিকদেরকে (অর্থাৎ আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই প্রমুখকে) দেখেন নি? ওরা তাদের (সহধর্মী) কিতাবধারী কাফির ভাইদেরকে বলে ঃ (অর্থাৎ বলত। কেননা, এই সূরা বনূ নুযায়েরের নির্বাসন ঘটনার পরে অবতীর্ণ হয়েছে)। আল্লাহ্‌র কসম, (আমরা সর্বাবস্থায় তোমাদের সাথে আছি)। যদি তোমরা (তোমাদের মাতৃভূমি থেকে জোর জবরে বহিষ্কৃত হও, তবে আমরাও) তোমাদের সাথে দেশত্যাগী হয়ে যাব এবং তোমাদের ব্যাপারে আমরা কখনও কারও কথা মানব না। অর্থাৎ তোমাদের সাথে আসার ব্যাপারে আমাদেরকে নিষেধ করে যে যতই বোঝাক না কেন, আমরা মানব না। আর যদি তোমরা আক্রান্ত হও, তবে আমরা তোমাদেরকে সাহায্য করব। আল্লাহ্ সাক্ষ্য দেন যে, তারা মিথ্যাবাদী। (এটা তাদের মিথ্যাবাদিতার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। অতঃপর বিস্তারিত বর্ণনা করা হচ্ছে ঃ) আল্লাহ্‌র কসম, যদি কিতাবধারী কাফিররা বহিষ্কৃত হয় তবে মুনাফিকরা তাদের সাথে দেশত্যাগ করবে না। আর যদি তারা আক্রান্ত হয়, তবে ওরা তাদেরকে সাহায্যও করবে না। যদি (অসম্ভবকে ধরে নেওয়ার পর্যায়ে) তাদেরকে সাহায্যও করে (এবং যুদ্ধে অংশ-গ্রহণ করে) তবে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করবে। এরপর (তাদের পলায়নের পর) কিতাবধারী কাফিররা কোন সাহায্য পাবে না। (অর্থাৎ সাহায্যকারী যারা ছিল, তারা তো পলায়ন করেছে। অন্য কোন সাহায্যকারীও হবে না। সুতরাং অবশ্যই পরাজিত ও পর্যুদস্ত হবে। মোটকথা, মুনাফিকদের উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের সহধর্মী ভাইদের উপর কোন বিপদ আসতে না দেওয়া। এই উদ্দেশ্য অর্জনে তারা সর্বতোভাবে ব্যর্থ মনোরথ হবে। বাস্তবে তাই হয়েছিল। পরিশেষে যখন বনূ নুযায়ের বহিষ্কৃত হয়, তখন মুনাফিকরা তাদের সাথে দেশত্যাগী হয়নি এবং প্রথম যখন তাদেরকে অবরোধ করা হয়, যাতে যুদ্ধের আশংকা ছিল, তখনও তারা কোন সাহায্য করেনি। ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পরে 'যদি বহিষ্কৃত হয়' ভবিষ্যৎ পদবাচ্য ব্যবহার করার এক কারণ অতীত ঘটনাকে উপস্থিত বিদ্যমান ধরে নেওয়া, যাতে অঙ্গীকার ভঙ্গ করা ও তাদের অসহায় থেকে যাওয়া দৃষ্টির সামনে ভাসমান হয়ে যায়। দ্বিতীয় কারণ ভবিষ্যৎ সাহায্যের সম্ভাবনাকে নাকচ করে দেওয়া। অতঃপর তাদের সাহায্য না করার কারণ বর্ণনা করা হচ্ছে ঃ) নিশ্চয় তোমরা তাদের (অর্থাৎ মুনাফিকদের) অন্তরে আল্লাহ্ অপেক্ষা অধিকতর ভয়াবহ। (অর্থাৎ ঈমান দাবী করে তারা আল্লাহ্‌র ভয় করে বলে প্রকাশ করে; এটা মিথ্যা। নতুবা তারা কুফরী

ছেড়ে দিত। আর তোমাদেরকে ওরা বাস্তবিকই ভয় করে। এই ভয়ের কারণে তারা বনূ নুযায়েরের সাথে সহযোগিতা করতে পারে না)। এটা (অর্থাৎ তোমাদেরকে ভয় করা এবং আল্লাহ্‌কে ভয় না করা) এ কারণে যে, তারা (কুফরের কারণে আল্লাহ্‌র মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করার ব্যাপারে) এক নির্বোধ সম্প্রদায়। (ইহুদী ও মুনাফিকরা আলাদা আলাদা-ভাবে তো তোমাদের মুকাবিলা করতেই পারে না) তারা সংঘবদ্ধভাবেও তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সক্ষম নয়। তারা যুদ্ধ করবে কেবল সুরক্ষিত জনপদে অথবা দুর্গ-প্রাচীরের আড়ালে থেকে। (পরিখা দ্বারা সুরক্ষিত হোক কিংবা দুর্গ ইত্যাদি দ্বারা। এতে জরুরী হয় না যে, কখনও এরূপ ঘটনা ঘটেছে এবং মুনাফিকরা কোন সুরক্ষিত স্থান ও দুর্গ থেকে মুসলমানদের মুকাবিলা করেছে। কারণ, উদ্দেশ্য এই যে, যদি কোন সময় ইহুদী কিংবা মুনাফিকরা আলাদা আলাদা অথবা সংঘবদ্ধভাবে তোমাদের মুকাবিলা করতে আসেও, তবুও তাদের মুকাবিলা সুরক্ষিত দুর্গে অথবা শহর-প্রাচীরের আড়ালে থেকে হবে। সেমতে বনী কুরায়যা ও খায়বরের ইহুদীরা এমনিভাবে মুসলমানদের মুকাবিলা করেছে। কিন্তু মুনাফিকরা তাদের সাথে সহযোগিতা করেনি এবং প্রকাশ্যে মুসলমানদের মুকাবিলায় আসতে কখনও সাহস করেনি। এতে মুসলমানদের মনোবলও বৃদ্ধি করা হয়েছে যে, তারা যেন ওদের পক্ষ থেকে কোন বিপদের আশংকা না করে। মুনাফিকদের কোন কোন গোত্র যেমন আউস ও খাযরাজের পারস্পরিক যুদ্ধ দেখে আশংকা করা উচিত নয় যে, তারা মুসলমানদের মুকাবিলায় এমনিভাবে আসতে পারবে। আসল ব্যাপার এই যে) তাদের যুদ্ধ পরস্পরের মধ্যেই প্রচণ্ড হয়ে থাকে। (মুসলমানদের মুকাবিলায় তারা কিছুই নয়। তারা সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে মুসলমানদের মুকাবিলা করতে পারবে---এরূপ আশংকা করাও ঠিক নয়। কেননা) তুমি তাদেরকে (বাহ্যত) ঐক্যবদ্ধ মনে করবে, অথচ তাদের অন্তর বিচ্ছিন্ন। (অর্থাৎ তারা মুসলমানদের শত্রুতায় অভিন্ন ঠিকই; কিন্তু তাদের মধ্যেও তো বিশ্বাসগত বিরোধের কারণে বিচ্ছিন্নতা ও শত্রুতা রয়েছে। সূরা মায়েদায় বলা হয়েছে :

وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ الخ—অতঃপর এই অনৈক্যের কারণ বর্ণনা করা হচ্ছেঃ) এটা (অর্থাৎ অন্তরের অনৈক্য) এ কারণে যে, তারা (ধর্মের ব্যাপারে) এক কাণ্ডজ্ঞানহীন সম্প্রদায়। (তাই প্রত্যেকেই নিজ নিজ খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে। আদর্শ ও লক্ষ্য বিভিন্ন হলে আন্তরিক বিচ্ছিন্নতা অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। এখানে তাদের অনৈক্যের কারণ বর্ণনা করা উদ্দেশ্য, সামগ্রিক নীতি বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয়। ফলে বে-দীনদের মধ্যেও কোন কোন সময় ঐক্য হতে পারে। অতঃপর বনূ নুযায়ের ও মুনাফিকদের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হচ্ছে, যারা সাহায্যের ওয়াদা করে ধোঁকা দিয়েছে এবং যথাসময়ে সাহায্য করেনি। তাদের সমষ্টির দু'টি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হয়েছে---একটি বনূ নুযায়েরের ও অপরটি মুনাফিকদের। বনূ নুযায়েরের দৃষ্টান্ত এই যে) তারা সেই লোকদের মত, যারা (দুনিয়াতে ও) তাদের নিকট পূর্বে নিজেদের কৃতকর্মের শাস্তি ভোগ করেছে এবং (পরকালেও) তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। [এখানে বনূ কায়নুকার ইহুদী সম্প্রদায়কে বোঝানো হয়েছে। তাদের ঘটনা এই : বদর যুদ্ধের পর তারা দ্বিতীয় হিজরীতে চুক্তিভঙ্গ করে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং পরাজিত ও পর্যুদস্ত হয়। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আদেশে তারা দুর্গ

থেকে বের হয়ে এলে তাদেরকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলা হয়। এরপর আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইয়ের কাকুতি-মিনতির কারণে মদীনা ত্যাগ করে চলে যাওয়ার শর্তে তাদের প্রাণ রক্ষা করা হয়। সেমতে তারা সিরিয়ার আমরুয়াতে চলে যায় এবং তাদের ধনসম্পত্তি যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ হিসাবে বন্টন করা হয়।---(যাদুল-মা'আদ) মুনাফিকদের দৃষ্টান্ত এই যে] তারা শয়তানের মত যে, (প্রথমে) মানুষকে কাফির হতে বলে অতঃপর যখন সে কাফির হয়ে যায়, (এবং দুনিয়াতে কিংবা পরকালে কুফরের শাস্তিতে পতিত হয়) তখন (পরিষ্কার জওয়াব দিয়ে দেয় এবং) বলেঃ তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমি তো বিশ্বপালনকর্তা আল্লাহ্‌কে ভয় করি। (দুনিয়াতে এরূপ সম্পর্কচ্ছেদের কাহিনী সূরা আন-ফালে এবং পরকালে সম্পর্কচ্ছেদের কথা একাধিক আয়াতে বর্ণিত হয়েছে)। অতঃপর উভয়ের (অর্থাৎ বনূ নুযায়ের ও মুনাফিকদের) শেষ পরিণতি হবে এই যে, তারা জাহান্নামে যাবে, সেখানে চিরকাল বসবাস করবে। এটাই জালিমদের শাস্তি। (সুতরাং শয়তান যেমন প্রথমে মানুষকে বিভ্রান্ত করে, এরপর বিপদমুহূর্তে চম্পট দেয়, ফলে উভয়েই বিপদগ্রস্ত হয়, তেমনি মুনাফিকরা প্রথমে বনূ নুযায়েরকে কুপরামর্শ দিয়েছে যে, তোমরা দেশত্যাগ করো না। এরপর যখন বনূ নুযায়ের বিপদের সম্মুখীন হল, তখন মুনাফিকদের পাত্তা পাওয়া গেল না। ফলে বনূ নুযায়ের নির্বাসনের বিপদে এবং মুনাফিকরা অকৃতকার্যতার অপমানে পতিত হল)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

كَمَثَلِ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيْبًا الخ ---এটা বনূ নুযায়েরের দৃষ্টান্ত। اَلَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ কারা? এ সম্পর্কে হযরত মুজাহিদ (র) বলেনঃ এরা হচ্ছে বদরের কাফির যোদ্ধা এবং হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেনঃ এরা ইহুদী বনূ কায়নুকা। উভয়েরই অশুভ পরিণতি তথা নিহত, পরাজিত ও লাঞ্ছিত হওয়ার ঘটনা তখন জনসমক্ষে ফুটে উঠেছিল। কেননা, বনূ নুযায়েরের নির্বাসনের ঘটনা বদর ও ওহুদ যুদ্ধের পরে সংঘটিত হয় এবং বনূ কায়নুকার ঘটনাও বদরের পরে সংঘটিত হয়ে গিয়েছিল। বদরে মুশরিক-দের সত্তরজন নেতা নিহত হয় এবং অবশিষ্টরা চরম লাঞ্ছিত অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করে। অতএব, হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-র উক্তি অনুযায়ী فَذَاقُوْا وَبَالَ اَمْرِهِمْ বাক্যের উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট যে, তারা তাদের কৃতকর্মের শাস্তি আস্বাদন করেছে। এটা পর-কালের আগে দুনিয়াতেই তারা ভোগ করেছে। পক্ষান্তরে হযরত মুজাহিদ (র)-এর উক্তি অনুযায়ী আয়াতের অর্থ ইহুদী বনূ কায়নুকা হলে তাদের ঘটনাও তেমনি শিক্ষাপ্রদ।

বনূ কায়নুকার নির্বাসনঃ রসূলে করীম (সা) মদীনায় আগমন করার পর মদীনার পার্শ্ববর্তী সবগুলো ইহুদী গোত্রের সাথে শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেন। এর এক শর্ত ছিল এই

যে, তারা রসূলুল্লাহ্ (সা) ও মুসলমানদের কোন শত্রুকে সাহায্য করবে না। বনূ কায়নুকাও এই শান্তিচুক্তির অধীনে ছিল। কিন্তু কয়েক মাস পরেই তারা চুক্তির বিপরীত কাজকর্ম শুরু করে দেয়। বদর যুদ্ধের সময় মক্কার কাফিরদের সাথে তাদের গোপন যোগসাজশ ও সাহায্যের কিছু ঘটনাও সামনে আসে। তখন কোরআন পাকের এই আয়াত অবতীর্ণ হয়ঃ وَاِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ اِلَيْهِمْ عَلٰى سَوَاءٍ অর্থাৎ চুক্তি সম্পাদনের পর যদি কোন সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে বিশ্বাসঘাতকতার আশংকা দেখা দেয়, তবে আপনি তাদের শান্তিচুক্তি ভণ্ডুল করে দিতে পারেন। বনূ কায়নুকা নিজেরাই বিশ্বাস-ঘাতকতা করে এই চুক্তি ভঙ্গ করে দিয়েছিল। তাই রসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করলেন এবং হযরত হামযা (রা)-র হাতে পতাকা দিলেন। মদীনা শহরে হযরত আবূ লুবাবা (রা)-কে স্থলাভিষিক্ত করে তিনি নিজেও জিহাদে রওয়ানা হলেন। মুসলমান সৈন্যবাহিনী দেখে বনূ কায়নুকা দুর্গাভ্যন্তরে আশ্রয় গ্রহণ করল। রসূলুল্লাহ্ (সা) দুর্গ অবরোধ করে নিলেন। পনের দিন অবরুদ্ধ থাকার পর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করে দিলেন---তাদের বুঝতে বাকী রইল না যে, মুকাবিলা ফলপ্রসূ হবে না। অগত্যা তারা দুর্গের ফটক খুলে দিয়ে বলল ঃ আমাদের সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সা) যে সিদ্ধান্ত নেবেন, আমরা তাতেই সম্মত আছি।

রসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের পুরুষকুলকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিতে চাইলেন; কিন্তু আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই মুনাফিক বাদ সাধল। সে চূড়ান্ত কাকুতি-মিনতি সহকারে তাদের প্রাণভিক্ষার আবেদন জানাল। অবশেষে রসূলুল্লাহ্ (সা) ঘোষণা করলেনঃ তারা বসতি ত্যাগ করে চলে যাবে এবং তাদের ধনসম্পত্তি যুদ্ধলব্ধ সম্পদরূপে পরিগণিত হবে। এই মীমাংসা অনুযায়ী বনূ কায়নুকা মদীনা ত্যাগ করে সিরিয়ার আমরুয়াত এলাকায় চলে গেল। যুদ্ধলব্ধ সম্পদ অধ্যাদেশ অনুযায়ী রসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের ধনসম্পত্তি বণ্টন করে এক ভাগ বায়তুলমালে এবং অবশিষ্ট চার ভাগ যোদ্ধাদের মধ্যে বিলি করে দিলেন।

বদর যুদ্ধের পর এই প্রথম বায়তুলমালে গনীমতের পাঁচ ভাগের এক ভাগ জমা হল। এই ঘটনা হিজরতের বিশ মাস পর ১৫-ই শাওয়াল তারিখে সংঘটিত হয়।

كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ اِذْ قَالَ لِلْاِنْسَانِ اكْفُرْ—এটা মুনাফিকদের দৃষ্টান্ত, যারা বনূ নুযায়েরকে নির্বাসনের আদেশ অমান্য করতে এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল এবং তাদেরকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু মুসলমানগণ যখন তাদেরকে অবরোধ করে নেয়, তখন কোন মুনাফিক সাহায্যার্থে অগ্রসর হয়নি। কোরআন পাক শয়তানের একটি ঘটনা দ্বারা তাদের দৃষ্টান্ত দিয়েছে। শয়তান মানুষকে কুফর করতে প্ররোচিত করেছিল এবং তার সাথে নানা রকম ওয়াদা-অঙ্গীকার করেছিল। কিন্তু মানুষ যখন কুফরে লিপ্ত হল, তখন সে ওয়াদা ভঙ্গ করল।

আল্লাহ্ জানেন শয়তানের এ ধরনের ঘটনা কত হয়ে থাকবে। তন্মধ্যে একটি ঘটনা তো স্বয়ং কোরআনে সূরা আনফালের নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছেঃ

وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ
وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ

এটা বদর যুদ্ধের ঘটনা। এতে শয়তান অন্তরে কুমন্ত্রণার মাধ্যমে অথবা মানবাকৃতিতে সামনে এসে মুশরিকদেরকে মুসলমানদের মুকাবিলায় উৎসাহিত করে এবং সাহায্যের আশ্বাস দেয়। কিন্তু যখন বাস্তবিকই মুকাবিলা শুরু হয়, তখন সাহায্য করতে পরিষ্কার অস্বীকৃতি জানায়। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ তৃতীয় খণ্ডে উল্লিখিত হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতে যদি এই ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়ে থাকে, তখন আপত্তি দেখা দেয় যে, এই ঘটনায় শয়তান বাহ্যত কুফর করার আদেশ দেয়নি। তারা তো পূর্ব থেকেই কাফির ছিল। শয়তান কেবল তাদেরকে মুকাবিলায় একত্রিত হতে বলেছিল। এই আপত্তির জওয়াব এই যে, কুফরে অটল থাকতে বলা এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বলাও কুফর করতে বলারই অনুরূপ।

তফসীরে মাযহারী, কুরতুবী, ইবনে কাসীর ইত্যাদি গ্রন্থে শয়তানের এই দৃষ্টান্তের ঘটনাবলী বর্ণনা প্রসঙ্গে বনী ইসরাঈলের কয়েকজন সন্ন্যাসী ও যোগীকে শয়তান কর্তৃক বিপথগামী করে কুফরী পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার কাহিনী বিধৃত হয়েছে। উদাহরণত বনী ইসরাঈলের জনৈক সন্ন্যাসী যোগী সদাসর্বদা উপাসনালয়ে যোগসাধনায় রত থাকত এবং দশ দিন অন্তর মাত্র একবার ইফতার করে রোযা রাখত। সত্তর বছর এমনিভাবে অতিবাহিত হওয়ার পর অভিশপ্ত শয়তান তার পেছনে লাগে। সে তার সর্বাধিক ধূর্ত ও চালাক অনুচরকে তার কাছে সন্ন্যাসী যোগী বেশে প্রেরণ করে। সে তার কাছে পৌঁছে তার চাইতেও বেশী যোগসাধনার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে। এভাবে সন্ন্যাসী তার প্রতি আস্থাশীল হয়ে উঠে।

অবশেষে কৃত্রিম সন্ন্যাসী আসল সন্ন্যাসীকে এমন দোয়া শিখিয়ে দিল, যদ্দ্বারা জটিল রোগীও আরোগ্য লাভ করত। এরপর সে অনেক লোককে নিজের প্রভাব দ্বারা রোগগ্রস্ত করে আসল সন্ন্যাসীর কাছে পাঠিয়ে দিত। যখন সন্ন্যাসী রোগীদের উপর দোয়া পাঠ করত, তখন শয়তান তার প্রভাব সরিয়ে নিত। ফলে রোগীরা আরোগ্য লাভ করত। সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত এই কারবার অব্যাহত রাখার পর সে জনৈক ইসরাঈলী সরদারের পরমা সুন্দরী কন্যার উপর নিজের প্রভাব বিস্তার করল এবং তাকে রোগগ্রস্ত করে সন্ন্যাসীর কাছে যাওয়ার পরামর্শ দিল। শেষ পর্যন্ত সে বালিকাটিকে সন্ন্যাসীর মন্দিরে পৌঁছে দিতে সক্ষম হল এবং কালক্রমে তাকে বালিকার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত করতেও কামিয়াব হয়ে গেল। এর ফলে বালিকা অন্তঃসত্ত্বা হয়ে গেল। অপমানের কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্য শয়তান বালিকাকে হত্যা করার পরামর্শ দিল। হত্যার পর শয়তান নিজেই ব্যভিচার ও হত্যার কাহিনী ফাঁস করে জনগণকে সন্ন্যাসীর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুলল। অতঃপর জনগণ মন্দির বিধ্বস্ত করে সন্ন্যাসীকে শূলে চড়ানোর সিদ্ধান্ত নিল। তখন শয়তান সন্ন্যাসীর কাছে যেয়ে বলল ঃ এখন তোমার প্রাণরক্ষার কোন উপায় নেই। তবে তুমি যদি আমাকে সিজদা

কর, তবে আমি তোমাকে বাঁচাতে পারব। সন্ন্যাসী পূর্বেই অনেক পাপ কর্ম করেছিল। ফলে কুফরের পথ অবলম্বন করা তার জন্য মোটেই কঠিন ছিল না। সে শয়তানকে সিজদা করল। তখন শয়তান পরিষ্কার বলে দিল ঃ আমি তোমাকে কুফরীতে লিপ্ত করার জন্যই এসব অপকৌশল অবলম্বন করেছিলাম। এখন আমি তোমাকে কোন সাহায্য করতে পারি না।

তফসীরে কুরতুবী ও মাযহারীতে এই ঘটনা বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١٩﴾ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۚ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٢٠﴾ لَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۖ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ ﴿٢٢﴾ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٢٣﴾ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ ۖ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ۚ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٤﴾

(১৮) হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর। প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত, আগামী-কালের জন্য সে কি প্রেরণ করে, তা চিন্তা করা। আল্লাহ্‌কে ভয় করতে থাক। তোমরা যা কর, আল্লাহ্ সে সম্পর্কে খবর রাখেন। (১৯) তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা আল্লাহ্‌কে ভুলে গেছে। ফলে আল্লাহ্ তাদেরকে আত্মবিস্মৃত করে দিয়েছেন। তারাই অবাধ্য। (২০) জাহান্নামের অধিবাসী এবং জান্নাতের অধিবাসী সমান হতে পারে না। যারা জান্নাতের অধিবাসী, তারাই সফলকাম। (২১) যদি আমি এই কোরআন পাহাড়ের উপর

অবতীর্ণ করতাম, তবে তুমি দেখতে যে, পাহাড় বিনীত হয়ে আল্লাহ্‌র ভয়ে বিদীর্ণ হয়ে গেছে। আমি এসব দৃষ্টান্ত মানুষের জন্য বর্ণনা করি, যাতে তারা চিন্তাভাবনা করে। (২২) তিনিই আল্লাহ্ তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই; তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যকে জানেন। তিনি পরম দয়ালু, অসীম দাতা। (২৩) তিনিই আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনিই একমাত্র মালিক, পবিত্র, শান্তি ও নিরাপত্তাদাতা, আশ্রয়দাতা, পরাক্রান্ত, প্রতাপান্বিত, মাহাত্ম্যশীল। তারা যাকে অংশীদার করে, আল্লাহ্ তা থেকে পবিত্র। (২৪) তিনিই আল্লাহ্, স্রষ্টা, উদ্ভাবক, রূপদাতা, উত্তম নামসমূহ তাঁরই। নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই তার পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

মু'মিনগণ! (অবাধ্যদের পরিণাম তোমরা শুনলে, অতএব) তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর। প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত আগামীকালের (অর্থাৎ কিয়ামতের) জন্য সে কি প্রেরণ করে, তা চিন্তা করা। (অর্থাৎ সৎ কর্ম অর্জনে ব্রতী হওয়া যা পরকালের সম্পদ। সৎ কর্ম অর্জনে যেমন আল্লাহ্‌কে ভয় করতে বলা হয়েছে, তেমনি মন্দ কাজ ও গোনাহ্ থেকে আত্মরক্ষার ব্যাপারে তোমাদেরকে আদেশ করা হচ্ছে যে) আল্লাহ্‌কে ভয় করতে থাক। তোমরা যা কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ সে সম্পর্কে খবর রাখেন। (সুতরাং গোনাহ্ করলে শাস্তির আশংকা আছে। প্রথমে اتَّقُوا اللَّهَ সৎ কর্ম সম্পর্কে এবং এর ইঙ্গিত হচ্ছে قَدَّمَتْ لِغَدٍ এবং দ্বিতীয় اتَّقُوا اللَّهَ পাপ কর্ম সম্পর্কে এবং এর ইঙ্গিত হচ্ছে خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ) তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা আল্লাহ্‌কে ভুলে গেছে। (অর্থাৎ তাঁর বিধি বিধান পালন করে না----আদেশের বিপরীত করে এবং নিষেধ মান্য করে না। ফলে আল্লাহ্ তাদেরকে আত্মভোলা করে দিয়েছেন অর্থাৎ তারা বুদ্ধি-বিবেকের এমন শত্রু হয়ে গেছে যে, নিজেদের সত্যিকার স্বার্থ বুঝেওনা এবং তা অর্জনও করে না)। তারাই অবাধ্য। (এবং অবাধ্যদের শাস্তি ভোগ করবে। উপরোল্লিখিত আল্লাহ্‌ভীতি অবলম্বনকারী ও বিধানাবলী অমান্যকারী দুই দলের মধ্য থেকে একদল জান্নাতের অধিবাসী এবং এক দল জাহান্নামের অধিবাসী) জাহান্নামের অধিবাসী ও জান্নাতের অধিবাসী সমান নয়; (বরং) যারা জান্নাতের অধিবাসী তারাই সফলকাম। (পক্ষান্তরে জাহান্নামীরা অকৃতকার্য; যেমন أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ দ্বারা জানা যায়। অতএব তোমাদের জান্নাতের অধিবাসী হওয়া উচিত----জাহান্নামের অধিবাসী হওয়া উচিত নয়। যে কোরআনের মাধ্যমে তোমাদেরকে এসব উপদেশ শোনানো হয়, তা এমন যে) যদি আমি এই কোরআন পাহাড়ের

উপর অবতীর্ণ করতাম (এবং তাতে বোধশক্তি রাখতাম এবং খেয়াল-খুশি অনুসরণের শক্তি না রাখতাম) তবে তুমি দেখতে যে, পাহাড় বিনীত হয়ে আল্লাহ্র ভয়ে বিদীর্ণ হয়ে গেছে। (অর্থাৎ কোরআন এমনি প্রভাবশালী ও ক্রিয়াশীল, কিন্তু মানুষের মধ্যে কুপ্রবৃত্তি প্রবল হওয়ার কারণে মানুষের সে যোগ্যতা বিনষ্ট হয়ে গেছে। ফলে সে প্রভাবান্বিত হয় না। অতএব সৎ কর্ম অর্জন ও পাপ কর্ম বর্জনের মাধ্যমে প্রবৃত্তিকে দমন করা উচিত, যাতে মানুষ কোরআনী উপদেশাবলী দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় এবং বিধানাবলী পালনে দৃঢ়তা অর্জিত হয়)। আমি এসব দৃষ্টান্ত মানুষের (উপকারের) জন্য বর্ণনা করি, যাতে তারা চিন্তাভাবনা করে (এবং উপকৃত হয়। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলার গুণাবলী বর্ণনা করা হচ্ছে, যাতে তাঁর মাহাত্ম্য অন্তরে বদ্ধমূল হওয়ার কারণে বিধানাবলী পালন করা সহজ হয়। ইরশাদ হয়েছে ঃ) তিনিই আল্লাহ্ তিনি ব্যতীত কোন (যোগ্য) উপাস্য নেই ; তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যকে জানেন, তিনি পরম দয়ালু, অসীম দাতা। (তওহীদ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিধায় তাকীদার্থে পুনশ্চ বলা হচ্ছে ঃ) তিনিই আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কোন (যোগ্য) উপাস্য নেই ; তিনি বাদশাহ্, (সকল দোষ থেকে) পবিত্র, মুক্ত, (অর্থাৎ অতীতেও তাঁর মধ্যে কোন দোষ ছিল না এবং ভবিষ্যতেও এর সম্ভাবনা নেই। বান্দাদেরকে ভয়ের বিষয় থেকে) নিরাপত্তাদাতা, (বান্দাদেরকে ভয়ের বিষয় থেকে) আশ্রয়দাতা (অর্থাৎ বিপদও আসতে দেন না এবং আগত বিপদও দূর করেন) পরাক্রান্ত, প্রতাপান্বিত, মাহাত্ম্যশীল। মানুষ যে শিরক করে, আল্লাহ্ তা থেকে পবিত্র। তিনিই (সত্য) আল্লাহ্, স্রষ্টা, সঠিক উদ্ভাবক, (অর্থাৎ সবকিছু রহস্য অনুযায়ী তৈরী করেন) রূপ (আকৃতি)-দাতা, উত্তম নামসমূহ তাঁরই। (এসব নাম উত্তম গুণাবলীর পরিচায়ক)। নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে সবই (কথার মাধ্যমে অথবা অবস্থার মাধ্যমে) তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়। (সুতরাং এমন মহান সত্তার নির্দেশাবলী অবশ্য পালনীয়)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা হাশরে শুরু থেকে কিতাবী, কাফির, মুশরিক ও মুনাফিকদের অবস্থা, কাজ-কারবার ও তাদের ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক শাস্তি বর্ণনা করার পর সূরার শেষ পর্যন্ত মু'মিনদেরকে হুঁশিয়ারি ও সৎ কর্মপরায়ণতার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

উল্লিখিত প্রথম আয়াতে বলিষ্ঠ ভঙ্গিতে পরকালের চিন্তা ও তজ্জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ আছে। বল হয়েছে ঃ يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ অর্থাৎ হে মু'মিনগণ, আল্লাহ্কে ভয় কর। প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত পরকালের জন্য সে কি প্রেরণ করেছে, তা চিন্তা করা।

এখানে কয়েকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। এক আয়াতে কিয়ামত বোঝাতে গিয়ে غد শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যার অর্থ আগামীকাল। এতে তিনটি ইঙ্গিত রয়েছে।

প্রথম. সমগ্র ইহকাল পরকালের মুকাবিলায় স্বল্প ও সংক্ষিপ্ত অর্থাৎ এক দিনের সমান। হিসাব করলে একদিনের সমান হওয়াও কঠিন। কেননা, পরকাল চিরন্তন, যার কোন শেষ ও অন্ত নেই। মানব-বিশ্বের বয়স তো কয়েক হাজার বছরই বলা হয়। যদি আকাশমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি থেকে হিসাব করা হয়, তবে কয়েক লাখ বছর হয়ে যাবে। তবুও এটা সীমিত সময়কাল। অসীম ও অশেষ সময়কালের সাথে এর কোন তুলনাই হয় না।

এক হাদীসে আছে الدنيا يوم ولنا فيه صوم — সারা দুনিয়া একদিন এবং এই দিনে আমাদের রোযা আছে। মানব সৃষ্টি থেকে শুরু করা হোক কিংবা আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি থেকে, চিন্তা করলে উভয়টিই মানুষের জন্য গুরুত্ববহ নয়; বরং প্রত্যেক ব্যক্তির দুনিয়া তার বয়সের বছর ও দিনগুলোই। এই বছর ও দিনগুলো পরকালের তুলনায় কত যে তুচ্ছ ও নগণ্য, তা প্রত্যেকেই অনুমান করতে পারে।

দ্বিতীয় ইঙ্গিত এই যে, কিয়ামত সুনিশ্চিত; যেমন আজকের পর আগামীকালের আগমন সুনিশ্চিত। কেউ এতে সন্দেহ করতে পারে না। এমনিভাবে দুনিয়ার পরে কিয়ামত ও পরকালের আগমনে কোন সন্দেহ নেই।

তৃতীয় ইঙ্গিত এই যে, কিয়ামত অতি নিকটবর্তী। আজকের পর আগামীকাল যেমন দূরে নয়---খুব নিকটবর্তী, তেমনি দুনিয়ার পর কিয়ামতও খুব নিকটবর্তী।

কিয়ামত দুই প্রকার---সমগ্র বিশ্বের কিয়ামত ও ব্যক্তি বিশেষের কিয়ামত। প্রথমোক্ত কিয়ামতের অর্থ আকাশমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের ধ্বংসপ্রাপ্তি। এটা লাখো বছর পরে হলেও পারলৌকিক সময়কালের তুলনায় নিকটবর্তীই। শেষোক্ত কিয়ামত ব্যক্তি বিশেষের মৃত্যুর সাথে সাথে সংঘটিত হয়। তাই বলা হয়েছে: من مات فقد قامت قيامته অর্থাৎ যে ব্যক্তি মারা যায়, তার কিয়ামত তখনই কায়েম হয়ে যায়। কারণ, কবর থেকেই পরজগতের ক্রিয়াকর্ম শুরু হয়ে যায় এবং আযাব ও সওয়াবের নমুনা সামনে এসে যায়। কবরজগৎ যার অপর নাম বরযখ, এটা দুনিয়ার 'ওয়েটিং রুম' (বিশ্রামাগার) সদৃশ। 'ওয়েটিং রুম' ফার্স্ট ক্লাস থেকে থার্ড ক্লাসের যাত্রীদের জন্য বিভিন্ন রূপ হয়ে থাকে। অপরাধীদের ওয়েটিং রুম হচ্ছে হাজত ও জেলখানা। এই বিশ্রামাগার থেকেই প্রত্যেক ব্যক্তি তার স্তর ও মর্যাদা নির্ধারণ করতে পারে। তাই মৃত্যুর সাথে সাথেই প্রত্যেকের নিজস্ব কিয়ামত এসে যায়। আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের মৃত্যুকে একটি ধাঁ-ধাঁর রূপ দিয়ে রেখেছেন। ফলে বড় বড় দার্শনিক ও বিজ্ঞানীগণও এর নিশ্চিত সময় নিরূপণ করতে পারে না, বরং প্রতিটি মুহূর্তেই মানুষ আশংকা করতে থাকে যে, পরের ঘন্টাটি তার জীবদ্দশায় অতিবাহিত নাও হতে পারে, বিশেষত বর্তমান বৈজ্ঞানিক উন্নতির যুগে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়ার ঘটনাবলী একে নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত করে দিয়েছে।

সারকথা এই যে, আলোচ্য আয়াতে কিয়ামতকে আগামীকাল বলে উদাসীন মানুষকে সাবধান করা হয়েছে যে, কিয়ামতকে বেশী দূরে মনে করো না। কিয়ামত আগামীকালের মত নিকটবর্তী; এমনকি আগামীকালের পূর্বেও এসে যাওয়া সম্ভবপর।

আয়াতে দ্বিতীয় প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা এতে মানুষকে

চিন্তা-ভাবনা করার দাওয়াত দিয়েছেন যে, নিশ্চিত ও নিকটবর্তী কিয়ামতের জন্য তুমি কি সম্বল প্রেরণ করেছ, তা ভেবে দেখ। এ থেকে জানা গেল যে, মানুষের আসল বাসস্থান হচ্ছে পরকাল। দুনিয়াতে সে মুসাফিরদের ন্যায় বসবাস করে। আসল বাসস্থানে অনন্তকাল অবস্থান করার জন্য এখান থেকেই কিছু সম্বল প্রেরণ করা জরুরী। দুনিয়াতে আসার আসল উদ্দেশ্যই এই যে, এখানে থেকে কিছু উপার্জন করবে, এরপর তা পরকালের দিকে পাঠিয়ে দেবে। বলা বাহুল্য, এখান থেকে দুনিয়ার আসবাবপত্র, ধনদৌলত ইত্যাদি কেউ সঙ্গে নিয়ে যেতে পারে না। বরং তা পাঠাবার একটি বিশেষ পদ্ধতি আছে। দুনিয়াতে এক দেশ থেকে অন্য দেশে টাকা-পয়সা নিয়ে যাওয়ার প্রচলিত পদ্ধতি এই যে, এই দেশের ব্যাংকে টাকা জমা দিয়ে অন্য দেশে প্রচলিত মুদ্রা অর্জন করতে হয়। পরকালের ব্যাপারেও একই পদ্ধতি চালু আছে। দুনিয়াতে যা কিছু আল্লাহ্র পথে ও আল্লাহ্র আদেশ পালনে ব্যয় করা হয়, তা আসমানী সরকারের ব্যাংকে (স্টেট ব্যাংক) জমা হয়ে যায়। এরপর সওয়াবের আকারে পরকালের মুদ্রা তার নামে লিখে দেওয়া হয়। পরকালে পৌঁছার পর দাবী-দাওয়া ব্যতিরেকেই এই সওয়াব তার হস্তগত হয়ে যায়।

مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ—বলে সৎ ও অসৎ উভয় প্রকার কর্ম বোঝানো হয়েছে। যে ব্যক্তি সৎ কর্ম প্রেরণ করে, সে সওয়াবের আকারে পরকালের মুদ্রা পেয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যে অসৎ কর্ম প্রেরণ করে, সে সেখানে অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত হবে। এরপর اِتَّقُوا اللّٰهَ বাক্যটি পুনরায় উল্লেখ করা হয়েছে। এর এক কারণ তাকীদ করা এবং অপর সম্ভাব্য কারণ তফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে।

এছাড়া এটাও সম্ভবপর যে, প্রথমে اِتَّقُوا اللّٰهَ বলে আল্লাহ্র নির্দেশাবলী পালন করে পরকালের জন্য সম্বল প্রেরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং দ্বিতীয় বার اِتَّقُوا اللّٰهَ বলে নির্দেশ করা হয়েছে যে, যে সম্বল প্রেরণ কর, তা কৃত্রিম ও পরকালে অচল কি না, তা দেখে নাও। পরকালে অচল সম্বল তাই, যা দৃশ্যত সৎ কর্ম, কিন্তু তা খাঁটিভাবে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য করা হয় না; বরং নাম-যশ অথবা কোন মানসিক স্বার্থের বশবর্তী হয়ে করা হয় অথবা সেই আমল, যা দৃশ্যত ইবাদত হলেও ধর্মে তার কোন প্রমাণ না থাকার কারণে বিদ'আত ও পথভ্রষ্টতা। অতএব দ্বিতীয় اِتَّقُوا اللّٰهَ বাক্যের সারমর্ম এই যে, পরকালের জন্য কেবল দৃশ্যত ? সম্বল যথেষ্ট নয়; বরং তা অচল কিনা তা দেখে প্রেরণ কর।

فَاَنْسٰهُمْ اَنْفُسَهُمْ—অর্থাৎ তারা আল্লাহ্কে ভুলে গিয়ে প্রকৃতপক্ষে নিজেরাই আত্মভোলা হয়ে গেছে। ফলে ভাল-মন্দের জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে।

لَوْ أَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ—এটা একটা দৃষ্টান্ত অর্থাৎ যদি কোরআন পাহাড়ের ন্যায় কঠিন ও ভারী জিনিসের উপর অবতীর্ণ করা হত এবং পাহাড়কে মানুষের ন্যায় জ্ঞানবুদ্ধি ও চেতনা দেওয়া হত, তবে পাহাড়ও কোরআনের মাহাত্ম্যের সামনে নত---বরং ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। কিন্তু মানুষ খেয়াল-খুশি ও স্বার্থপরতায় লিপ্ত হয়ে তার স্বভাবজাত চেতনা হারিয়ে ফেলেছে। সে কোরআন দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় না। অতএব এটা যেন এক কাল্পনিক দৃষ্টান্ত। কারণ, বাস্তবে পাহাড়ের মধ্যে চেতনা নেই। কেউ কেউ বলেন ঃ পাহাড়, বৃক্ষ, ইত্যাদি বস্তুর মধ্যে চেতনা ও অনুভূতি বিদ্যমান আছে। কাজেই এটা কাল্পনিক নয়---বাস্তবভিত্তিক দৃষ্টান্ত।---(মাযহারী)

পরকালের চিন্তা ও কোরআনের মাহাত্ম্য বর্ণনা করার পর উপসংহারে আল্লাহ্ তা'আলার কতিপয় পূর্ণত্ববোধক গুণ উল্লেখ করে সূরা সমাপ্ত করা হয়েছে।

عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ—অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক দৃশ্য-অদৃশ্য ও উপস্থিত-অনুপস্থিত বিষয় পুরোপুরি জানেন। اَلْقُدُّوْسُ—এমনি সত্তা, যিনি প্রত্যেক দোষ থেকে মুক্ত এবং অশালীন বিষয়াদি থেকে পবিত্র। اَلْمُؤْمِنُ—এই শব্দটি মানুষের জন্য ব্যবহৃত হলে এর অর্থ হয় আল্লাহ্ ও রসূলে বিশ্বাসী। আল্লাহ্‌র জন্য ব্যবহার করলে অর্থ হয় নিরাপত্তা বিধায়ক অর্থাৎ তিনি ঈমানদারগণকে সর্বপ্রকার আযাব ও বিপদ থেকে শান্তি এবং নিরাপত্তা দান করেন।

اَلْمُهَيْمِنُ---এর অর্থ দেখাশোনাকারী। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) মুজাহিদ ও কাতাদাহ্ (র) তাই বলেছেন।---(মাযহারী, কামূস)

اَلْجَبَّارُ—প্রতাপশালী মহান। এই শব্দটি جبر থেকেও উদ্ভূত হতে পারে, যার অর্থ ভাঙা হাড় ইত্যাদি সংযোগ করা। এ কারণেই ভাঙা হাড় জোড়া দেওয়ার পর যে পট্টি বাঁধা হয়, তাকে جبيرة বলা হয়। অতএব অর্থ এই যে, তিনি প্রত্যেক ভাঙা ও অকেজো বস্তুর সংস্কারক।---(মাযহারী)

اَلْمُتَكَبِّرُ—এটা كبرياء ও تكبر থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ বড়ত্ব. প্রত্যেক বড়ত্ব প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলার জন্য নির্দিষ্ট। তিনি কোন বিষয়ে কারও মুখাপেক্ষী নন। যে মুখাপেক্ষী, সে বড় হতে পারে না। তাই আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্যের জন্য এই শব্দটি দোষ ও গোনাহ্। কারণ, সত্যিকার বড় না হয়ে বড়ত্ব দাবী করা মিথ্যা এবং আল্লাহ্‌র বিশেষ গুণে শরীক হওয়ার দাবী। তাই এটা আল্লাহ্‌র জন্য পূর্ণত্বের গুণ এবং অন্যের জন্য মিথ্যা দাবী।

اَلْمُصَوِّرُ —অর্থাৎ রূপ দানকারী। উদ্দেশ্য এই যে, সমগ্র সৃষ্ট বস্তুকে আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষ বিশেষ আকার ও আকৃতি দান করেছেন, যদ্দরুন এক বস্তু অপর বস্তু থেকে পৃথক ও স্বতন্ত্র হয়েছে। আকাশস্থ ও পৃথিবীস্থ সকল সৃষ্ট বস্তু বিশেষ আকারের মাধ্যমেই পরিচিত হয়। সৃষ্ট বস্তুর অসংখ্য প্রকারের আলাদা আলাদা আকার-আকৃতি। মানুষের একই শ্রেণীর মধ্যে পুরুষ ও নারীর আকার-আকৃতিতে পার্থক্য, কোটি কোটি নারী ও পুরুষের চেহারায় এমন স্বাতন্ত্র্য যে, একজনের মুখাবয়ব অন্যজনের সাথে মিলে না---এটা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই অপার শক্তির কারসাজি। এতে অন্য কেউ তাঁর অংশীদার নয়। বড়ত্ব যেমন আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের জন্য বৈধ নয় এবং এটা একমাত্র তাঁরই গুণ, তেমনি চিত্র ও আকার-আকৃতি নির্মাণ অন্যের জন্য বৈধ নয়। এটাও আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ গুণে তাঁর সাথে অংশীদারিত্ব দাবী করার নামান্তর।

لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى —অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার উত্তম উত্তম নাম আছে। কোরআন পাকে এসব নামের সংখ্যা নির্দিষ্ট নেই। সহীহ্ হাদীসসমূহে ৯৯-টি নাম বর্ণিত আছে। তিরমিযীর এক হাদীসে সবগুলোই উল্লিখিত হয়েছে।

يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ —এই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা অবস্থার মাধ্যমে হলে তা বর্ণনাসাপেক্ষ নয়; কেননা, সমগ্র সৃষ্ট জগৎ ও তার অন্তর্নিহিত কারিগরি এবং আকার-আকৃতি নিজ নিজ অবস্থার মাধ্যমে অহর্নিশ স্রষ্টার প্রশংসা ও গুণ-কীর্তনে মশগুল আছে। সত্যিকার উক্তির মাধ্যমে তসবীহ্ পাঠও হতে পারে। কেননা, সুচিন্তিত অভিমত এই যে, প্রত্যেক বস্তুই নিজ নিজ সীমায় চেতনা ও অনুভূতিসম্পন্ন। জ্ঞান-বুদ্ধি ও চেতনার সর্বপ্রথম দাবী হচ্ছে স্রষ্টাকে চিনা ও তাঁর কৃতজ্ঞ হওয়া। অতএব, প্রত্যেক বস্তুর সত্যিকার তসবীহ্ পাঠ করা অসম্ভব নয়। তবে আমরা নিজ কানে তা শুনি না। এ কারণেই কোরআন পাকের এক জায়গায় বলা হয়েছে: وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ অর্থাৎ তোমরা তাদের তসবীহ্ শোন না, বুঝ না।

সূরা হাশরের সর্বশেষ আয়াতসমূহের উপকারিতা ও কল্যাণ: তিরমিযীতে হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার (রা)-এর বর্ণিত রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন: যে ব্যক্তি সকালে তিনবার اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ পাঠ করার পর সূরা হাশরের هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ থেকে শেষ পর্যন্ত সর্বশেষ তিন আয়াত পাঠ করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য সত্তর হাজার ফেরেশতা নিযুক্ত করে দেবেন। তারা সন্ধ্যা পর্যন্ত তার জন্য রহমতের দোয়া করবে। সেদিন সে মারা গেলে শহীদের মৃত্যু হাসিল হবে। যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় এভাবে পাঠ করবে, সে-ও এই মর্তবা লাভ করবে। ---(মাযহারী)

سورة الممتحنة

সূরা মুমতাহিনা

মদীনায় অবতীর্ণ, ১৩ আয়াত, ২ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّيْ وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَآءَ تُلْقُوْنَ
اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوْا بِمَا جَآءَكُمْ مِّنَ الْحَقِّ ۚ يُخْرِجُوْنَ
الرَّسُوْلَ وَاِيَّاكُمْ اَنْ تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ رَبِّكُمْ ؕ اِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا
فِيْ سَبِيْلِيْ وَابْتِغَآءَ مَرْضَاتِيْ تُسِرُّوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ ۖ وَاَنَا اَعْلَمُ
بِمَآ اَخْفَيْتُمْ وَمَآ اَعْلَنْتُمْ ؕ وَمَنْ يَّفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ
السَّبِيْلِ ۝١ اِنْ يَّثْقَفُوْكُمْ يَكُوْنُوْا لَكُمْ اَعْدَآءً وَّيَبْسُطُوْٓا اِلَيْكُمْ
اَيْدِيَهُمْ وَاَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوْٓءِ وَوَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ ۝٢ لَنْ تَنْفَعَكُمْ اَرْحَامُكُمْ
وَلَآ اَوْلَادُكُمْ ۚ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝٣
قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ ۚ اِذْ قَالُوْا
لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَءٰٓؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۫ كَفَرْنَا
بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَآءُ اَبَدًا حَتّٰى تُؤْمِنُوْا
بِاللّٰهِ وَحْدَهٗٓ اِلَّا قَوْلَ اِبْرٰهِيْمَ لِاَبِيْهِ لَاَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ اَمْلِكُ
لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ؕ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَاِلَيْكَ اَنَبْنَا وَاِلَيْكَ
الْمَصِيْرُ ۝٤ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا ۚ

إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۞ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ
يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ۞

পরম করুণাময় ও অসীম দাতা আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) হে মু'মিনগণ! তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা তো তাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাও, অথচ তারা যে সত্য তোমাদের কাছে আগমন করেছে, তা অস্বীকার করছে। তারা রাসূলকে ও তোমাদেরকে বহিষ্কৃত করে এই অপরাধে যে, তোমরা তোমাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস রাখ। যদি তোমরা আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য এবং আমার পথে জিহাদ করার জন্য বের হয়ে থাক, তবে কেন তাদের প্রতি গোপনে বন্ধুত্বের পয়গাম প্রেরণ করছ? তোমরা যা গোপন কর এবং যা প্রকাশ কর, তা আমি খুব জানি। তোমাদের মধ্যে যে এটা করে, সে সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়। (২) তোমাদেরকে করতলগত করতে পারলে তারা তোমাদের শত্রু হয়ে যাবে এবং মন্দ উদ্দেশ্যে তোমাদের প্রতি বাহু ও রসনা প্রসারিত করবে এবং চাইবে যে, কোনরূপে তোমরাও কাফির হয়ে যাও। (৩) তোমাদের স্বজন-পরিজন ও সন্তান-সন্ততি কিয়ামতের দিন কোন উপকারে আসবে না। তিনি তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করবেন। তোমরা যা কর, আল্লাহ্ তা দেখেন। (৪) তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তাঁর সংগীগণের মধ্যে চমৎকার আদর্শ রয়েছে। তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিলঃ তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যার ইবাদত কর, তার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদেরকে মানি না। তোমরা এক আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করলে তোমাদের মধ্যে ও আমাদের মধ্যে চিরশত্রুতা থাকবে। কিন্তু ইবরাহীমের উক্তি তাঁর পিতার উদ্দেশ্যে এই আদর্শের ব্যতিক্রম। তিনি বলেছিলেনঃ আমি অবশ্যই তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব। তোমার উপকারের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে আমার আর কিছু করার নেই। হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা তোমারই উপর ভরসা করেছি, তোমারই দিকে মুখ করেছি এবং তোমারই নিকট আমাদের প্রত্যাবর্তন। (৫) হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি আমাদেরকে কাফিরদের জন্য পরীক্ষার পাত্র করো না, হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে ক্ষমা কর। নিশ্চয় তুমি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (৬) তোমরা যারা আল্লাহ্ ও পরকাল প্রত্যাশা কর, তোমাদের জন্য তাদের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে। আর যে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার জানা উচিত যে, আল্লাহ্ বেপরোয়া, প্রশংসার মালিক।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

মু'মিনগণ! তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। (অর্থাৎ আন্তরিক বন্ধুত্ব না হলেও বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহারও করো না)। তোমরা তো তাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাও, অথচ তারা যে সত্য তোমাদের কাছে আগমন করেছে তা অস্বীকার করে।

(এতে বোঝা যায় যে, তারা আল্লাহ্‌র শত্রু)। তারা রাসূল (সা)-কে ও তোমাদেরকে বহিষ্কৃত করে এই অপরাধে যে, তোমরা তোমাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস রাখ। (এতে বোঝা যায় যে, তারা কেবল আল্লাহ্‌রই শত্রু নয়---তোমাদেরও শত্রু। মোটকথা, এদের সাথে বন্ধুত্ব করো না)। যদি তোমরা আমার পথে জিহাদ করার জন্য ও আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য (নিজেদের ঘর-বাড়ী থেকে) বের হয়ে থাক, তবে (কাফিরদের বন্ধুত্বের জন্য যার সারমর্ম কাফিরদের সন্তুষ্টি অর্জন করা এবং যা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও তাঁর উপযুক্ত কাজকর্মের পরিপন্থী) কেন তাদের সাথে গোপনে বন্ধুত্বের কথাবার্তা বলছ? (অর্থাৎ প্রথমত বন্ধুত্বই মন্দ, এরপর গোপন বার্তা প্রেরণ করা যা বিশেষ সম্পর্কের পরিচায়ক, তা আরও মন্দ)। অথচ তোমরা যা গোপন কর এবং যা প্রকাশ কর, তা আমি খুব জানি। (অর্থাৎ উপরোক্ত বাধা-সমূহের অনুরূপ 'আমি সব জানি' এটাও তাদের বন্ধুত্বের পথে বাধা হওয়া উচিত। অতঃপর এর জন্য শাস্তিবাণী উচ্চারণ করা হচ্ছেঃ) তোমাদের মধ্যে যে এরূপ করে, সে সরলপথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়। (আর বিচ্যুতদের পরিণাম তো জানাই আছে। তারা তো তোমাদের এমন শত্রু যে) তোমাদেরকে করতলগত করতে পারলে তারা (তৎক্ষণাৎ) শত্রুতা প্রকাশ করতে থাকে এবং (সেই শত্রুতা প্রকাশ এই যে,) মন্দ উদ্দেশ্যে তোমাদের প্রতি বাহু ও রসনা প্রসারিত করে (এটা পার্থিব ক্ষতি) এবং (ধর্মীয় ক্ষতি এই যে,) এরা চায় যে, তোমরা কাফিরই হয়ে যাও। (সুতরাং এরূপ লোক বন্ধুত্বের যোগ্য নয়। বন্ধুত্বের ব্যাপারে যদি তোমরা তোমাদের পরিবার-পরিজনের নিরাপত্তার কথা চিন্তা কর, তবে খুব বুঝে নাও,) তোমাদের স্বজন-পরিজন ও সন্তান-সন্ততি কিয়ামতের দিন তোমাদের (কোন) উপকারে আসবে না। তিনিই তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করবেন। তোমরা যা কর, আল্লাহ্ তা দেখেন। [সুতরাং প্রত্যেক কর্মের সঠিক ফয়সালা করবেন। তোমাদের কর্ম শাস্তির কারণ হলে সন্তান-সন্ততি ও আত্মীয়-স্বজন এই শাস্তি থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারবে না। এমতাবস্থায় তাদের খাতিরে আল্লাহ্‌র নির্দেশ অমান্য করা খুবই গর্হিত কাজ। এ থেকে আরও স্পষ্টরূপে জানা যায় যে, ধনসম্পদ খাতির করার যোগ্য নয়। অতঃপর উল্লিখিত আদেশ পালনে উদ্বুদ্ধ করার জন্য ইবরাহীম (আ)-এর ঘটনার অবতারণা করা হচ্ছেঃ] তোমাদের জন্য ইবরাহীম (আ) ও তাঁর (ঈমান ও আনুগত্যে) সমমনাদের মধ্যে চমৎকার আদর্শ রয়েছে। [অর্থাৎ এ ব্যাপারে কাফিরদের সাথে এরূপ ব্যবহার করা উচিত, যেরূপ ইবরাহীম (আ) ও তাঁর অনুসারিগণ করেছেন]। তারা (বিভিন্ন সময়ে) তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিলঃ তোমাদের সাথে এবং আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তোমরা যার ইবাদত কর, তার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। ['বিভিন্ন সময়ে' বলার কারণ এই যে, ইবরাহীম (আ) যখন প্রথমবার সম্প্রদায়কে একথা বলেছিলেন, তখন তিনি সম্পূর্ণ একা ছিলেন। এরপর যে-ই তাঁর অনুসরণ করেছে, সে-ই কাফিরদের সাথে কথায় ও কাজে সম্পর্কচ্ছেদ করেছে। অতঃপর এই সম্পর্কচ্ছেদের রূপরেখা বর্ণনা করা হচ্ছেঃ] আমরা তোমাদেরকে (অর্থাৎ কাফির ও তাদের উপাস্যদেরকে) মানি না (অর্থাৎ তোমাদের বিশ্বাস ও উপাস্যদের ইবাদত মানি না। এরপর লেনদেন ও ব্যবহারের দিক দিয়ে সম্পর্কচ্ছেদ এই যে) আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে চিরন্তন শত্রুতা প্রকাশ পেয়েছে (কেননা, শত্রুতার ভিত্তি হচ্ছে বিশ্বাসগত বিরোধ। এখন এটা বেশী ফুটে উঠার কারণে শত্রুতাও ফুটে উঠেছে। এই শত্রুতা চিরকাল থাকবে) যে পর্যন্ত তোমরা এক আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না কর।

[মোটকথা, ইবরাহীম (আ) ও তাঁর অনুসারিগণ কাফিরদের সাথে পুরোপুরি সম্পর্কছেদ করলেন]। কিন্তু ইবরাহীম (আ)-এর উক্তি তাঁর পিতার উদ্দেশে, (এই আদর্শের ব্যতিক্রম। এতে বাহ্যত কাফিরদের সাথে ভালবাসা ও বন্ধুত্ব বোঝা যাচ্ছিল)। তিনি বলেছিলেন ঃ আমি তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব। তোমার উপকারের জন্য (ক্ষমা প্রার্থনার বেশী) আল্লাহ্‌র কাছে আমার কিছু করার নেই। [অর্থাৎ দোয়া কবুল করাতে পারি না অথবা বিশ্বাস স্থাপন না করা সত্ত্বেও তোমাকে আযাব থেকে রক্ষা করব, তা পারি না। উদ্দেশ্য এই যে, ইবরাহীম (আ) এর এতটুকু কথার অর্থ কেউ কেউ এরূপ বুঝে নিয়েছে যে, এটা ক্ষমা প্রার্থনাই। অথচ এখানে ক্ষমা প্রার্থনার অর্থ অন্যরূপ। অর্থাৎ পিতার জন্য এরূপ দোয়া করা যে, সে বিশ্বাস স্থাপন করে ক্ষমার যোগ্য হয়ে থাকে। সবাই এরূপ করতে পারে। বাস্তবে এটা সম্পর্কছেদের পরিপন্থী নয়। কিন্তু দৃশ্যত এতে সম্পর্ক স্থাপন ও ক্ষমা প্রার্থনার অর্থ থাকায় একে ব্যতিক্রমভুক্ত করা হয়েছে। এ পর্যন্ত সম্প্রদায়ের সাথে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর কথাবার্তা বর্ণিত হল। অতঃপর আল্লাহ্‌র কাছে দোয়ার বিষয় বর্ণনা করা হচ্ছে। অর্থাৎ কাফিরদের সাথে সম্পর্কছেদ করে তিনি এ সম্পর্কে আল্লাহ্‌র কাছে আরয করলেন ঃ] হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা (কাফিরদের সাথে সম্পর্কছেদ ও শত্রুতা ঘোষণা করার ব্যাপারে) আপনার উপর ভরসা করেছি এবং (আপনিই আমাদেরকে সকল বিপদাপদ ও শত্রুদের উৎপীড়ন থেকে রক্ষা করবেন। এছাড়া বিশ্বাস স্থাপনের ব্যাপারে) আপনার দিকেই মুখ করেছি। (আমাদের বিশ্বাস এই যে) আপনারই নিকট আমাদের প্রত্যাবর্তন। সুতরাং এই বিশ্বাসের কারণে আমরা আন্তরিকতার সাথে কাফিরদের সাথে সম্পর্কছেদ করেছি। এতে কোন পার্থিব স্বার্থ নেই। হে আমাদের পালনকর্তা! আপনি আমাদেরকে কাফিরদের উৎপীড়নের পাত্র করবেন না। (অর্থাৎ এই সম্পর্কছেদের কারণে কাফিররা যেন আমাদের উপর জুলুম করতে না পারে)। হে আমাদের পালনকর্তা ! আমাদের পাপ মার্জনা করুন। নিশ্চয় আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। তোমাদের জন্য অর্থাৎ যারা আল্লাহ্‌র (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কাছে যাওয়ার) এবং কিয়ামতের (আগমনের) বিশ্বাস রাখে, তাদের জন্য তাঁদের মধ্যে [অর্থাৎ ইবরাহীম (আ) ও তাঁর অনুসারীদের মধ্যে] উত্তম আদর্শ রয়েছে। যে ব্যক্তি (এই আদেশ থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয়, (সে তার নিজের ক্ষতি করে, কেননা) আল্লাহ্ বেপরোয়া (এবং পূর্ণতাগুণে গুণান্বিত হওয়ার কারণে) প্রশংসার্হ।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এই সূরার শুরুভাগে কাফির ও মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখতে নিষেধ করা হয়েছে এবং একটি বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই অংশ অবতীর্ণ হয়েছে।

শানে নুযূল ঃ তফসীর কুরতুবীতে কুশায়রী ও সা'লাবীর বরাত দিয়ে বর্ণিত আছে যে, বদর যুদ্ধের পর মক্কা বিজয়ের পূর্বে মক্কার সারা নাম্নী একজন গায়িকা নারী প্রথমে মদীনায় আগমন করে। রসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ তুমি কি হিজরত করে মদীনায় এসেছ? সে বলল ঃ না। আবার জিজ্ঞাসা করা হল ঃ তবে কি তুমি মুসলমান হয়ে এসেছ? সে এরও নেতিবাচক উত্তর দিল। রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ তা হলে কি উদ্দেশ্যে

আগমন করেছ? সে বলল ঃ আপনারা মক্কার সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোক ছিলেন। আপনাদের মধ্য থেকে আমি জীবিকা নির্বাহ করতাম। এখন মক্কার বড় বড় সরদাররা বদর যুদ্ধে নিহত হয়েছে এবং আপনারা এখানে চলে এসেছেন। ফলে আমার জীবিকা নির্বাহ কঠিন হয়ে গেছে। আমি ঘোর বিপদে পড়ে ও অভাবগ্রস্ত হয়ে আপনাদের কাছ থেকে সাহায্য গ্রহণের উদ্দেশ্যে এখানে আগমন করেছি। রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ তুমি মক্কার পেশাদার গায়িকা। মক্কার সেই যুবকরা কোথায় গেল, যারা তোমার গানে মুগ্ধ হয়ে টাকা-পয়সার বৃষ্টি বর্ষণ করে? সে বলল ঃ বদর যুদ্ধের পর তাদের উৎসবপর্ব ও গান-বাজনার জৌলুস খতম হয়ে গেছে। এ পর্যন্ত তারা কেউ আমাকে আমন্ত্রণ জানায়নি। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সা) আবদুল মুত্তালিব বংশের লোকগণকে তাকে সাহায্য করার জন্য উৎসাহ দিলেন। তারা তাকে নগদ টাকা-পয়সা, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি দিয়ে বিদায় দিল।

এটা তখনকার কথা, যখন মক্কার কাফিররা হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ করেছিল এবং রসূলুল্লাহ্ (সা) কাফিরদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার ইচ্ছায় গোপনে প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তাঁর আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, এই গোপন তথ্য পূর্বাহ্নে মক্কাবাসীদের কাছে ফাঁস না হোক। এদিকে সর্বপ্রথম হিজরতকারীদের মধ্যে একজন সাহাবী ছিলেন হাতেব ইবনে আবী বালতায়া (রা)। তিনি ছিলেন ইয়ামেনী বংশোদ্ভূত এবং মক্কায় এসে বসবাস অবলম্বন করেছিলেন। মক্কায় তাঁর স্বগোত্র বলতে কেউ ছিল না। মক্কায় বসবাসকালেই মুসলমান হয়ে মদীনায় হিজরত করেছিলেন। তাঁর স্ত্রী ও সন্তানগণও মক্কায় ছিল। রসূলুল্লাহ্ (সা) ও অনেক সাহাবীর হিজরতের পর মক্কায় বসবাসকারী মুসলমানদের উপর কাফিররা নির্যাতন চালাত এবং তাদেরকে উত্ত্যক্ত করত। যেসব মুহাজিরের আত্মীয়-স্বজন মক্কায় ছিল, তাঁদের সন্তান-সন্ততিরা কোনরূপে নিরাপদে ছিল। হাতেব চিন্তা করলেন যে, তাঁর সন্তান-সন্ততিকে শত্রুর নির্যাতন থেকে বাঁচিয়ে রাখার কেউ নেই। অতএব, মক্কাবাসীদের প্রতি কিছু অনুগ্রহ প্রদর্শন করলে তারা হয়তো তাঁর সন্তানদের উপর জুলুম করবে না। তাই গায়িকার মক্কা গমনকে তিনি একটি সুবর্ণ সুযোগ হিসাবে গ্রহণ করলেন।

হাতেব স্বস্থানে নিশ্চিত বিশ্বাসী ছিলেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আল্লাহ্ তা'আলা বিজয় দান করবেন। এই তথ্য ফাঁস করে দিলে তাঁর কিংবা ইসলামের কোন ক্ষতি হবে না। তিনি ভাবলেন, আমি যদি পত্র লিখে মক্কার কাফিরদেরকে জানিয়ে দিই যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) তোমাদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করার ইচ্ছা রাখেন, তবে আমার ছেলেপেলেদের হিফাযত হয়ে যাবে। সুতরাং হাতেব এই ভুলটি করে ফেললেন এবং মক্কাবাসীদের নামে একটি পত্র লিখে গায়িকা সারার হাতে সোপর্দ করলেন।---(কুরতুবী, মাযহারী)

এদিকে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আল্লাহ্ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে ব্যাপারটি জানিয়ে দিলেন। তিনি আরও জানতে পারলেন যে, মহিলাটি এ সময়ে রওযায়ে খাক নামক স্থান পর্যন্ত পৌঁছে গেছে।

বুখারী ও মুসলিমে হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে, আবূ মুরসাদকে ও যুবায়র ইবনে আওয়ামকে আদেশ দিলেন ঃ অশ্বে আরোহণ করে সেই মহিলার পশ্চাদ্ধাবন কর। তোমরা তাকে রওযায়ে খাকে পাবে। তার সাথে মক্কাবাসীদের

নামে হাতেব ইবনে আবী বালতায়ার পত্র আছে। তাকে পাকড়াও করে পত্রটি ফিরিয়ে নিয়ে আস। হযরত আলী (রা) বলেন ঃ আমরা নির্দেশমত দ্রুতগতিতে তার পশ্চাদ্ধাবন করলাম। রসূলুল্লাহ্ (সা) যে স্থানের কথা বলেছিলেন, ঠিক সে স্থানেই আমরা তাকে উটে সওয়ার হয়ে যেতে দেখলাম এবং তাকে পাকড়াও করলাম। আমরা বললাম, পত্রটি বের কর। সে বলল ঃ আমার কাছে কারও কোন পত্র নেই। আমরা তার উটকে বসিয়ে দিলাম। এরপর তালাশ করে কোন চিঠি পেলাম না। আমরা মনে মনে বললাম, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সংবাদ ভ্রান্ত হতে পারে না। নিশ্চয়ই সে পত্রটি কোথাও গোপন করেছে। এবার আমরা তাকে বললাম ঃ হয় পত্র বের কর, না হয় আমরা তোমাকে বিবস্ত্র করে দেব।

অগত্যা সে নিরুপায় হয়ে পায়জামার ভেতর থেকে পত্র বের করে দিল। আমরা পত্র নিয়ে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে চলে এলাম। হযরত উমর (রা) ঘটনা শুনা মাত্রই ক্রোধে অগ্নি-শর্মা হয়ে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে আরয করলেন ঃ এই ব্যক্তি আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও সকল মুসলমানের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। সে আমাদের গোপন তথ্য কাফিরদের কাছে লিখে পাঠিয়েছে। অতএব, অনুমতি দিন আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেব।

রসূলুল্লাহ্ (সা) হাতেবকে ডেকে এনে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমাকে এই কাণ্ড করতে কিসে উদ্বুদ্ধ করল? হাতেব আরয করলেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার ঈমানে এখনও কোন তফাত হয়নি। ব্যাপার এই যে, আমি ভাবলাম, আমি যদি মক্কাবাসীদের প্রতি একটু অনুগ্রহ প্রদর্শন করি তবে তারা আমার বাচ্চা-কাচ্চাদের কোন ক্ষতি করবে না। আমি ব্যতীত অন্য কোন মুহাজির এরূপ নেই, যার স্বগোত্রের লোক মক্কায় বিদ্যমান নেই। তাদের স্বগোত্রীয়রা তাদের পরিবার-পরিজনের হিফাযত করে।

রসূলুল্লাহ্ (সা) হাতেবের জবানবন্দি শুনে বললেন ঃ সে সত্য বলেছে। অতএব, তার ব্যাপারে তোমরা ভাল ছাড়া মন্দ বলো না। হযরত উমর (রা) ঈমানের জোশে নিজ বাক্যের পুনরাবৃত্তি করলেন এবং তাঁকে হত্যা করার অনুমতি চাইলেন। রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ সে কি বদর যোদ্ধাদের একজন নয়? আল্লাহ্ তা'আলা বদর যোদ্ধাদেরকে ক্ষমা করার ও তাদের জন্য জান্নাতের ঘোষণা দিয়েছেন। একথা শুনে হযরত উমর (রা) অশ্রুবিগলিত কণ্ঠে আরয করলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূলই আসল সত্য জানেন।---(ইবনে কাসীর) কোন কোন রেওয়ায়েতে হাতেবের এই উক্তিও বর্ণিত আছে যে, আমি এ কাজ ইসলাম ও মুসলমান-দের ক্ষতি করার জন্য করিনি। কেননা, আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-ই বিজয়ী হবেন। মক্কাবাসীরা জেনে গেলেও তাতে কোন ক্ষতি হবে না।

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সূরা মুমতাহিনার শুরুভাগের আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়। এসব আয়াতে উপরোক্ত ঘটনার জন্য হুঁশিয়ার করা হয় এবং কাফিরদের সাথে মুসলমান-দের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখা হারাম সাব্যস্ত করা হয়।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ

تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ — অর্থাৎ মু'মিনগণ, তোমরা আমার শত্রু ও তোমাদের

শত্রুকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করো না যে, তোমরা তাদের কাছে বন্ধুত্বের বার্তা প্রেরণ করবে। এতে উল্লিখিত ঘটনার প্রতিই ইঙ্গিত রয়েছে। অর্থাৎ এ ধরনের পত্র কাফিরদের কাছে লিখা বন্ধুত্বের বার্তা প্রেরণ করারই নামান্তর। আয়াতে 'কাফির' শব্দ বাদ দিয়ে 'আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রু' বলে প্রথমত এই নির্দেশের কারণ ও দলীল ব্যক্ত করা হয়েছে যে, নিজেদের ও আল্লাহ্‌র শত্রুর কাছে বন্ধুত্ব আশা করা আত্মপ্রবঞ্চনা বৈ নয়। অতএব এ থেকে বিরত থাক। দ্বিতীয়ত এদিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কাফির যে পর্যন্ত কাফির থাকবে, সে কোন মুসলমানের বন্ধু হতে পারে না। সে আল্লাহ্‌র দুশমন। অতএব যে মুসলমান আল্লাহ্‌র মহব্বত দাবী করে, তার সাথে কাফিরের বন্ধুত্ব কিরূপে সম্ভবপর?

وَقَدْ كَفَرُوْا بِمَا جَاءَكُمْ مِّنَ الْحَقِّ يُخْرِجُوْنَ الرَّسُوْلَ وَاِيَّاكُمْ اَنْ

تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ رَبِّكُمْ—এখানে حق বলে কোরআন অথবা ইসলাম বোঝানো হয়েছে। এই আয়াতে তাদের শত্রুতার আসল কারণ কুফর বর্ণনা করার পর তাদের বাহ্যিক শত্রুতাও প্রকাশ করা হয়েছে যে, তারা তোমাদেরকে এবং তোমাদের রসূলকে প্রিয় মাতৃভূমি থেকে বহিষ্কার করেছে। এই বহিষ্কারের কারণ কোন পার্থিব বিষয় নয়। বরং একমাত্র তোমাদের ঈমানই এর কারণ ছিল। অতএব একথা আর গোপন রইল না যে, তোমরা যে পর্যন্ত মু'মিন থাকবে তারা তোমাদের বন্ধু হতে পারে না। হাতেব মনে করেছিল যে, তাদের প্রতি একটু অনুগ্রহ করলে তারা তার পরিবার-পরিজনের হিফাযত করবে। তার এই ধারণা ভ্রান্ত। কারণ, ঈমানের কারণে তারা তোমাদের শত্রু। আল্লাহ্ না করুন, তোমাদের ঈমান বিলুপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তাদের সাথে বন্ধুত্বের আশা করা ধোঁকা বৈ নয়।

اِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِىْ سَبِيْلِىْ وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِىْ এতেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, তোমাদের হিজরত যদি বাস্তবিকই আল্লাহ্‌র জন্য ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ছিল, তবে আল্লাহ্‌র শত্রু কাফিরদের কাছে এই আশা কিরূপে রাখা যায় যে, তারা তোমাদের খাতির করবে?

تُسِرُّوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَاَنَا اَعْلَمُ بِمَا اَخْفَيْتُمْ وَمَا اَعْلَنْتُمْ

এতে আরও বলা হয়েছে যে, যারা কাফিরদের সাথে গোপনে বন্ধুত্ব রাখে তারা যেন মনে না করে যে, তাদের এই কার্যকলাপ গোপন থেকে যাবে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের গোপন ও প্রকাশ্য সব কাজকর্মের খবর রাখেন; যেমন উল্লিখিত ঘটনায় তিনি তাঁর রসূলকে ওহীর মাধ্যমে অবগত করে চক্রান্ত ধরিয়ে দিয়েছেন।

إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ

بِالسُّوءِ—অর্থাৎ সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও তারা তোমাদের সাথে উদার ব্যবহার করবে, তাদের কাছে এরূপ প্রত্যাশা করা দুরাশা মাত্র। তারা যখনই তোমাদের উপর প্রাধান্য হাসিল করবে, তখনই তাদের বাহু ও রসনা তোমাদের অনিষ্ট ছাড়া কোন দিকে প্রসারিত হবে না।

وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ—এতে ইঙ্গিত আছে যে, যখন তোমরা তাদের প্রতি বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করবে, তখন তাদের বন্ধুত্ব কেবল তোমাদের ঈমানের বিনিময়ে লাভ করতে পারবে। তোমরা কুফরে লিপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তারা তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবে না।

لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন তোমাদের আত্মীয়তা ও তোমাদের সন্তান-সন্তুতি তোমাদের উপকারে আসবে না। আল্লাহ্ তা'আলা সেদিন এসব সম্পর্ক ছিন্ন করে দেবেন। সন্তানরা পিতামাতার কাছ থেকে ও পিতামাতারা সন্তানদের কাছ থেকে পলায়ন করবে। এতে হযরত হাতেবের ওযর খণ্ডন করা হয়েছে যে, যে সন্তানদের মহব্বতে তুমি এ কাজ করেছিলে, মনে রেখ, কিয়ামতের দিন তারা তোমার কোন উপকারে আসবে না। আল্লাহ্র কাছে কোন কিছু গোপন নয়।

পরবর্তী আয়াতসমূহে কাফিরদের সাথে সম্পর্কছেদের সমর্থনে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁর সমস্ত জ্ঞাতিগোষ্ঠী মুশরিক ছিল। তিনি সবার সাথে শুধু সম্পর্কছেদই নয়--শত্রুতাও ঘোষণা করেছিলেন এবং বলেছিলেন ঃ যে পর্যন্ত তোমরা বিশ্বাস স্থাপন না করবে এবং শিরক থেকে বিরত না হবে, সেই পর্যন্ত তোমাদের ও আমাদের মধ্যে শত্রুতার প্রাচীর অন্তরায় হয়ে থাকবে।

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ থেকে حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ পর্যন্ত আয়াতে তাই বলা হয়েছে।

একটি সন্দেহের জওয়াব ঃ উপরের আয়াতে মুসলমানদেরকে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর উত্তম আদর্শ ও সুন্নত অনুসরণ করার জোর আদেশ দেওয়া হয়েছে। ইবরাহীম (আ) তাঁর মুশরিক পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন বলেও প্রমাণিত আছে। সূরা তওবায় এর

উল্লেখ আছে। অতএব সন্দেহ হতে পারত যে, মুশরিক পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের জন্যও মাগফিরাতের দোয়া করা ইবরাহিমী আদর্শের অন্তর্ভুক্ত এবং এটা জায়েয হওয়া উচিত। তাই ইবরাহিমী আদর্শের অনুসরণ থেকে একে ব্যতিক্রম প্রকাশ করে বলা হয়েছে যে, অন্য সব বিষয়ে ইবরাহিমী আদর্শের অনুসরণ জরুরী কিন্তু তাঁর এই কাজটির অনুসরণ মুসলমানদের জন্য জায়েয নয়। إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ আয়াতের মর্ম তাই। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ওযর সূরা তওবায় বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি পিতার জন্য মাগ-ফিরাতের দোয়া নিষেধাজ্ঞার পূর্বে করেছিলেন, অথবা এই ধারণার বশবর্তী হয়ে করেছিলেন যে, তার অন্তরে ঈমান বিদ্যমান আছে, কিন্তু পরে যখন জানলেন যে, সে আল্লাহ্‌র দুশমন, তখন এ বিষয় থেকে নিজের বিমুখতা ঘোষণা করলেন। فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ আয়াতের উদ্দেশ্য তাই।

কোন কোন তফসীরবিদ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ-কে বিচ্ছিন্ন ব্যতিক্রম সাব্যস্ত করেছেন। এর সারমর্ম এই যে, ইবরাহীম (আ) যে পিতার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করে-ছিলেন, এটা তাঁর আদর্শের পরিপন্থী নয়। কেননা, তিনি পিতা মুসলমান হয়ে গেছে ---এই ধারণার বশবর্তী হয়ে দোয়া করেছিলেন। এরপর যখন তিনি আসল সত্য জানতে পারেন, তখন দোয়া ছেড়ে দেন এবং সম্পর্কচ্ছেদের কথা ঘোষণা করেন। এরূপ করা এখনও জায়েয। কোন কাফির সম্পর্কে যদি কারও প্রবল ধারণা থাকে যে, সে মুসলমান, তবে তার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করায় কোন দোষ নেই।---(কুরতুবী) তফসীরের সার-সংক্ষেপে এই ব্যাখ্যাই অবলম্বিত হয়েছে।

عَسَى اللّٰهُ أَنْ يَّجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ عَادَيْتُمْ مِّنْهُمْ مَّوَدَّةً ط
وَاللّٰهُ قَدِيْرٌ ط وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ لَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَا
تِلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَ
تُقْسِطُوْا إِلَيْهِمْ ط إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ۝ إِنَّمَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ
عَنِ الَّذِيْنَ قٰتَلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَأَخْرَجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَ

ظٰهَرُوْا عَلٰٓى اِخْرَاجِكُمْ اَنْ تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۝

(৭) যারা তোমাদের শত্রু, আল্লাহ্ তাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সম্ভবত বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে দেবেন। আল্লাহ্ সবই করতে পারেন এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, করুণাময়। (৮) ধর্মের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেনি এবং তোমাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কৃত করেনি, তাদের প্রতি সদাচরণ ও ইনসাফ করতে আল্লাহ্ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। নিশ্চয় আল্লাহ্ ইনসাফকারীদেরকে ভালবাসেন। (৯) আল্লাহ্ কেবল তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন, যারা ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, তোমাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কৃত করেছে এবং বহিষ্কারকার্যে সহায়তা করেছে। যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে তারাই জালিম।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(যেহেতু কাফিরদের শত্রুতার কথা শুনে মুসলমানরা চিন্তান্বিত হতে পারত এবং সম্পর্কচ্ছেদের কারণে স্বভাবত তাদের মনে দুঃখ লাগতে পারত, তাই সুসংবাদের ভঙ্গিতে অতঃপর ভবিষ্যদ্বাণী করা হচ্ছে যে) যারা তোমাদের শত্রু, সম্ভবত (অর্থাৎ ওয়াদা এই যে) আল্লাহ্ তাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে দেবেন (যদিও কিছু সংখ্যকের সাথে অর্থাৎ তাদেরকে মুসলমান করে দেবেন। ফলে শত্রুতা বন্ধুত্বে পর্যবসিত হয়ে যাবে)। এবং (একে অসম্ভব মনে করো না। কেননা) আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান। (সেমতে মক্কা বিজয়ের দিন অনেকেই মুসলমান হয়ে যায়। উদ্দেশ্য এই যে, সম্পর্কচ্ছেদ চিরকালের জন্য হলেও তা আদিষ্ট বিষয় হওয়ার কারণে অবশ্য পালনীয় ছিল। কিন্তু যখন তা স্বল্পকালের জন্য এবং মুসলমান হওয়ার ফলে বন্ধুত্ব ও সম্পর্ক পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে, তখন চিন্তান্বিত হওয়ার কোন কারণ নেই। এ পর্যন্ত কেউ যদি এই আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে থাকে এবং পরে তওবা করে থাকে তবে) আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, করুণাময়। (এ পর্যন্ত সম্পর্কচ্ছেদের আদেশ সম্পর্কে বলা হয়েছে। অতঃপর অনুগ্রহমূলক সম্পর্ক রাখার বিবরণ দেওয়া হচ্ছেঃ) আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সাথে সদাচরণ ও ইনসাফ করতে তোমাদেরকে নিষেধ করেন না, যারা ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বহিষ্কৃত করেনি। (এখানে যিম্মী অথবা শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ কাফিরদেরকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ তাদের সাথে সদাচরণ জায়েয। অবশ্য ন্যায় ও সুবিচারের জন্য যিম্মী ও চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া শর্ত নয়। এটা প্রত্যেক কাফির এমনকি জন্তু-জানোয়ারের সাথেও ওয়াজিব। কিন্তু আয়াতে ন্যায় ও ইনসাফ বলে অনুগ্রহমূলক ব্যবহার বোঝানো হয়েছে। তাই বিশেষভাবে যিম্মী ও চুক্তিতে আবদ্ধ কাফিরের মধ্যেই সীমিত রাখা হয়েছে)। আল্লাহ্ তা'আলা ইনসাফকারীদেরকে ভালবাসেন। (অবশ্য)

আল্লাহ্ তা'আলা কেবল তাদের সাথে বন্ধুত্ব (ও অনুগ্রহ) করতে তোমাদেরকে নিষেধ করেন, যারা ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, (কার্যক্ষেত্রে অথবা ইচ্ছার মাধ্যমে) তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বহিষ্কৃত করেছে এবং (বহিষ্কৃত না করলেও) বহিষ্কার-কার্যে (বহিষ্কারকারীদেরকে) সাহায্য করেছে। অর্থাৎ তাদের সাথে শরীক রয়েছে, কার্যত কিংবা বহিষ্কার করার ইচ্ছার মাধ্যমে। যেসব কাফিরের সাথে মুসলমানদের শান্তিচুক্তি অথবা বশ্যতা স্বীকারের বন্ধন ছিল না, তারা সবই এর অন্তর্ভুক্ত। তাদের সাথে অনুগ্রহ-মূলক কাজ-কারবার জায়েয নয়; (বরং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাই কাম্য)। যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব (অর্থাৎ অনুগ্রহমূলক ব্যবহার) করবে, তারাই পাপিষ্ঠ।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফিরদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপারে কঠোর নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে; যদিও সেই কাফির আত্মীয়তায় খুবই নিকটবর্তী হয়। সাহাবায়ে কিরাম আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রসূলের নির্দেশাবলী পালনের ব্যাপারে নিজেদের খাহেশ ও আত্মীয়-স্বজনের পরোয়া করতেন না। তাঁরা এই নিষেধাজ্ঞাও বাস্তবায়িত করলেন। ফলে দেখা গেল যে, ঘরে ঘরে পিতা পুত্রের সাথে এবং পুত্র পিতার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেছে। বলা বাহুল্য, মানবপ্রকৃতি ও স্বভাবের জন্য এ কাজ সহজ ছিল না। তাই আলোচ্য আয়াত-সমূহে আল্লাহ্ তা'আলা এই সংকটকে অতিসত্বর দূর করার আশ্বাসবাণী শুনিয়েছেন।

কোন কোন হাদীসে আছে, আল্লাহ্‌র কোন বান্দা যখন আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য নিজের কোন প্রিয় বস্তুকে বিসর্জন দেয়, তখন প্রায়ই আল্লাহ্ তা'আলা সেই বস্তুকেই হালাল করে তার কাছে পৌঁছিয়ে দেন এবং অনেক সময় এর চাইতেও উত্তম বস্তু প্রদান করেন।

আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা ইঙ্গিত করেছেন যে, আজ যারা কাফির, ফলে তারা তোমাদের শত্রু ও তোমরা তাদের শত্রু, সত্বরই হয়তো আল্লাহ্ তা'আলা এই শত্রুতাকে বন্ধুত্বে পর্যবসিত করে দেবেন অর্থাৎ তাদেরকে ঈমানের তওফীক দিয়ে তোমাদের পারস্পরিক সুসম্পর্ককে নতুন ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করে দেবেন। এই ভবিষ্যদ্বাণী মক্কা বিজয়ের সময় বাস্তব রূপ লাভ করে। ফলে নিহতদের বাদ দিয়ে অবশিষ্ট সকল কাফির মুসলমান হয়ে যায়।---(মাযহারী) কোরআন পাকের এক আয়াতে এর বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে: يَدْخُلُوْنَ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا অর্থাৎ তারা দলে দলে আল্লাহ্‌র দীন ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করবে; বাস্তবেও তাই হয়েছে।

বুখারী ও মসনদে আহ্‌মদের রেওয়ায়েতে আছে, হযরত আসমা (রা)-র জননী হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর স্ত্রী কবীলা হুদায়বিয়া সন্ধির পর কাফির অবস্থায় মক্কা থেকে মদীনায় পৌঁছেন। তিনি কন্যা আসমার জন্য কিছু উপঢৌকনও সাথে নিয়ে যান। কিন্তু হযরত আসমা (রা) সেই উপঢৌকন গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে জিজ্ঞাসা করলেন: আমার জননী আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছেন,

কিন্তু তিনি কাফির। আমি তাঁর সাথে কিরূপ ব্যবহার করব? রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ জননীর সাথে সদ্ব্যবহার কর। এর পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয় ঃ

لَا يَنْهَاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ

কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, হযরত আসমা (রা)-র জননী কবীলাকে হযরত আবূ বকর (রা) ইসলাম পূর্বকালেই তালাক দিয়েছিলেন। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) হযরত আবূ বকর (রা)-এর অপর স্ত্রী উম্মে রোমানের গর্ভজাত ছিলেন। উম্মে রোমান মুসলমান হয়ে যান।---(ইবনে কাসীর, মাযহারী)

যেসব কাফির মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কারেও অংশগ্রহণ করেনি, আলোচ্য আয়াতে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করার ও ইনসাফ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ন্যায় ও সুবিচার তো প্রত্যেক কাফিরের সাথেও জরুরী। এতে যিম্মী কাফির, চুক্তিতে আবদ্ধ কাফির এবং শত্রু কাফির সবই সমান বরং ইসলামে জন্তু-জানোয়ারের সাথেও সুবিচার করা ওয়াজিব অর্থাৎ তাদের পৃষ্ঠে সাধ্যের বাইরে বোঝা চাপানো যাবে না এবং ঘাস-পানি ও বিশ্রামের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে।

মাস'আলা ঃ এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নফল দান-খয়রাত যিম্মী ও চুক্তিবদ্ধ কাফিরকেও দেওয়া যায়। কেবল শত্রুদেশের কাফিরকে দেওয়া নিষিদ্ধ।

اِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ قَاتَلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ—এই আয়াতে সেই সব কাফিরের বর্ণনা আছে, যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত থাকে এবং মুসলমানদেরকে স্বদেশ থেকে বহিষ্কারে অংশগ্রহণ করে। তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন। এতে অনুগ্রহমূলক কাজ-কারবার করতে নিষেধ করা হয়নি; বরং শুধু আন্তরিক বন্ধুত্ব ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখতে নিষেধ করা হয়েছে। এরূপ কেবল যুদ্ধরত শত্রুদের সাথেই নয়; বরং যিম্মী ও চুক্তিবদ্ধ কাফিরদের সাথেও জায়েয নয়। এ থেকে তফসীরে-মাযহারীতে মাস'আলা বের করা হয়েছে যে, যুদ্ধরত কাফিরদের সাথে ন্যায় ও সুবিচার করা তো জরুরীই; নিষিদ্ধ নয়। এ থেকে বোঝা গেল যে, অনুগ্রহপূর্ণ ব্যবহার যুদ্ধরত শত্রুদের সাথেও জায়েয। তবে অন্যান্য প্রমাণের ভিত্তিতে এর জন্য শর্ত এই যে, তাদের সাথে অনুগ্রহপূর্ণ ব্যবহারের কারণে মুসলমানদের কোনরূপ ক্ষতি হওয়ার আশংকা যেন না থাকে। আশংকা থাকলে জায়েয নয়। তবে ন্যায় ও সুবিচার প্রত্যেকের সাথে সর্বাবস্থায় জরুরী ও ওয়াজিব।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا جَآءَكُمُ الْمُؤْمِنٰتُ مُهٰجِرٰتٍ فَامْتَحِنُوْهُنَّ ؕ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِهِنَّ ۚ فَاِنْ عَلِمْتُمُوْهُنَّ مُؤْمِنٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوْهُنَّ اِلَى

الْكُفَّارِ ۖ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۖ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا ۚ
وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَلَا
تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا ۚ
ذَٰلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ ۖ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾ وَإِن فَاتَكُمْ
شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَا
جُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿١١﴾ يَا أَيُّهَا
النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ
شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ
بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ ۙ
فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ
الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ ﴿١٣﴾

(১০) হে মু'মিনগণ! যখন তোমাদের কাছে ঈমানদার নারীরা হিজরত করে আগমন করে, তখন তাদেরকে পরীক্ষা করো। আল্লাহ্ তাদের ঈমান সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন। যদি তোমরা জান যে, তারা ঈমানদার, তবে আর তাদেরকে কাফিরদের কাছে ফেরত পাঠিও না। এরা কাফিরদের জন্য হালাল নয় এবং কাফিররা এদের জন্য হালাল নয়। কাফিররা যা ব্যয় করেছে, তা তাদের দিয়ে দাও। তোমরা, এই নারীদেরকে প্রাপ্য মোহরানা দিয়ে বিবাহ করলে তোমাদের কোন অপরাধ হবে না। তোমরা কাফির নারীদের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রেখো না। তোমরা যা ব্যয় করেছ, তা চেয়ে নাও এবং তারাও চেয়ে নিবে যা তারা ব্যয় করেছে। এটা আল্লাহ্‌র বিধান; তিনি তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (১১) তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যদি কেউ হাতছাড়া হয়ে কাফির-দের কাছে থেকে যায়, অতঃপর তোমরা সুযোগ পাও, তখন যাদের স্ত্রী হাতছাড়া হয়ে গেছে, তাদেরকে তাদের ব্যয়কৃত অর্থের সমপরিমাণ অর্থ প্রদান কর এবং আল্লাহকে ভয় কর, যার

প্রতি তোমরা বিশ্বাস রাখ। (১২) হে নবী, ঈমানদার নারীরা যখন আপনার কাছে এসে আনুগত্যের শপথ করে যে, তারা আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, তাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, জারজ সন্তানকে স্বামীর ঔরস থেকে আপন গর্ভজাত সন্তান বলে মিথ্যা দাবী করবে না এবং ভাল কাজে আপনার অবাধ্যতা করবে না, তখন তাদের আনুগত্য গ্রহণ করুন এবং তাদের জন্য আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, অত্যন্ত দয়ালু। (১৩) হে মু'মিনগণ! আল্লাহ্ যে জাতির প্রতি রুষ্ট, তোমরা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করো না। তারা পরকাল সম্পর্কে নিরাশ হয়ে গেছে যেমন কবরস্থ কাফিররা নিরাশ হয়ে গেছে।

শানে-নুযূলের ঘটনা ঃ আলোচ্য আয়াতগুলোও একটি বিশেষ ঘটনা অর্থাৎ হুদায়-বিয়ার সন্ধির সাথে সম্পর্কযুক্ত। সূরা ফাত্হ-এর শুরুতে এই সন্ধি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এই সন্ধির যেসব শর্ত ছিল, তন্মধ্যে একটি ছিল এই যে, মুসলমানদের মধ্য থেকে যদি কোন ব্যক্তি কাফিরদের কাছে চলে যায়, তবে তাকে ফেরত দেওয়া হবে না। পরন্তু কাফিরদের মধ্য থেকে যদি কোন ব্যক্তি মুসলমানদের কাছে চলে যায়, তবে তাকে ফেরত দিতে হবে। সেমতে কিছু মুসলমান পুরুষ কাফিরদের মধ্য থেকে আগমন করে এবং তাদেরকে ফেরত পাঠানো হয়। এরপর কয়েকজন নারী মুসলমান হয়ে আগমন করে। তাদের কাফির আত্মীয়রা তাদেরকে প্রত্যর্পণের আবেদন জানায়। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতগুলো হুদায়বিয়ায় অবতীর্ণ হয়। এতে নারীদেরকে ফেরত পাঠাতে নিষেধ করা হয়েছে। সুতরাং এই নিষেধাজ্ঞার ফলে সন্ধিপত্রের ব্যাপকতা সংকুচিত ও রহিত হয়ে গেছে। এ ধরনের নারীদের ব্যাপারে কিছু বিশেষ বিধানও নির্ধারণ করা হয়েছে এবং এর সাথে এমন নারীদের ব্যাপারেও কিছু বিধান বর্ণিত হয়েছে, যারা প্রথমে মুসলমানদের সাথে বিবাহিতা ছিল ; কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করেনি এবং মক্কাতেই থেকে যায়। মুসলমান হওয়াই এই নারীদের বেলায় আসল ভিত্তি বিধায় তাদের ঈমান পরীক্ষা করার পদ্ধতিও বর্ণনা করা হয়েছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

মু'মিনগণ! যখন তোমাদের কাছে ঈমানদার নারীরা (দারুল-হরব থেকে) হিজরত করে আগমন করে, [দারুল-ইসলাম মদীনায় আসুক কিংবা দারুল-ইসলামের পর্যায়ভুক্ত হুদায়বিয়ার সেনা ছাউনিতে আসুক—(হিদায়া)] তখন তাদেরকে পরীক্ষা করে নাও (যে, সত্যিই মুসলমান কিনা। পরবর্তী يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ আয়াতে এই পরীক্ষার পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। এ ব্যাপারে বাহ্যিক পরীক্ষাকেই যথেষ্ট মনে কর। কেননা) তাদের (সত্যিকার) ঈমান সম্পর্কে আল্লাহ্ সম্যক অবগত আছেন। (তোমরা প্রকৃত অবস্থা জান-তেই পার না)। যদি তোমরা (এই পরীক্ষার আলোকে) জান যে, তারা ঈমানদার, তবে আর তাদেরকে কাফিরদের কাছে ফেরত পাঠিও না। (কেননা) তারা কাফিরদের জন্য হালাল নয় এবং কাফিররা তাদের জন্য হালাল নয়। (কারণ, মুসলমান নারীর বিবাহ কাফির

পুরুষের সাথে কোন অবস্থাতেই বজায় থাকে না। এমতাবস্থায়) কাফিররা (মোহরানা বাবদ তাদের পেছনে) যা ব্যয় করেছে, তা তাদেরকে দিয়ে দাও। তোমরা এই নারীদেরকে প্রাপ্য মোহরানা দিয়ে বিবাহ করলে তোমাদের কোন অপরাধ হবে না। (মুসলমানগণ) তোমরা কাফির নারীদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক বজায় রেখো না। (অর্থাৎ তোমাদের যেসব স্ত্রী শত্রুদেশে কাফির অবস্থায় রয়ে গেছে, তোমাদের সাথে তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গেছে। তাদের সম্পর্কের কোন চিহ্ন বাকী আছে বলে মনে করো না। এমতাবস্থায়) তোমরা (সেই নারীদের মোহরানা বাবদ) যা ব্যয় করেছ, তা (কাফিরদের কাছ থেকে) চেয়ে নাও এবং (এমনিভাবে) কাফিররাও চেয়ে নেবে যা (মোহরানা বাবদ) তারা ব্যয় করেছে। এটা (অর্থাৎ যা বলা হল) আল্লাহ্‌র বিধান। (এর অনুকরণ কর)। তিনি তোমাদের মধ্যে (এমনি উপযুক্ত) ফয়সালা করেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (তিনি জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অনুযায়ী উপযুক্ত বিধান নির্ধারণ করেন)। যদি তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে কেউ কাফি-রদের মধ্যে থেকে যাওয়ার কারণে (সম্পূর্ণই) তোমাদের হাতছাড়া হয়ে যায় (অর্থাৎ তাকেও পাওয়া না যায়। এরপর কাফিরদেরকে) তোমাদের (পক্ষ থেকে মোহরানা দেওয়ার) সুযোগ হয় অর্থাৎ (কোন কাফিরের মোহরানা তোমাদের উপর পরিশোধযোগ্য হয়) তবে (তোমরা সেই মোহরানা কাফিরকে দিও না, বরং) যেসব মুসলমানের স্ত্রীগণ হাতছাড়া হয়ে গেছে, তাদেরকে তাদের (স্ত্রীদের উপর) ব্যয়কৃত অর্থের সমপরিমাণ (সেই পরিশোধযোগ্য মোহ-রানা থেকে) দিয়ে দাও এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর, যার প্রতি তোমরা বিশ্বাস রাখ। (জরুরী বিধি-বিধানে ত্রুটি করো না। অতঃপর বিশেষ সম্বোধনে ঈমান পরীক্ষার পদ্ধতি বর্ণনা করা হচ্ছে ঃ) হে পয়গম্বর (সা)! মুসলমান নারীরা যখন আপনার কাছে এসে আনুগত্যের শপথ করে যে, তারা আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, তাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, জারজ সন্তানকে স্বামীর ঔরস থেকে আপন গর্ভজাত সন্তান বলে মিথ্যা দাবী করবে না (মূর্খতা যুগে) কোন কোন নারী অপরের সন্তান এনে নিজ স্বামীর সন্তান বলে চালিয়ে দিত অথবা জারজ সন্তানকে স্বামীর ঔরসজাত সন্তান বলে দিত। এতে ব্যভিচারের গোনাহ্ তো আছেই; পরন্তু অপরের সন্তানকে স্বামীর সন্তান দাবী করার পাপও আছে। হাদীসে এ সম্পর্কে কঠোর শাস্তিবাণী বর্ণিত আছে।---(আবূ দাউদ, নাসায়ী)। এবং ভাল কাজে আপনার অবাধ্যতা করবে না, তখন তাদের আনুগত্য গ্রহণ করুন এবং তাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, করুণাময়। (উদ্দেশ্য এই যে, তারা যখন এসব বিধানকে সত্য এবং অবশ্য পালনীয় মনে করার বিষয় প্রকাশ করে, তখন তাদেরকে মুসলমান মনে করুন। স্বয়ং ইসলাম গ্রহণ করার কারণে অতীত সব গোনাহ্ মাফ হয়ে যায়, তবুও এখানে ক্ষমা প্রার্থনার আদেশ মাগফিরাতের লক্ষণ হাসিল করার জন্য অথবা এটা ঈমান কবূলের দোয়া, যদ্দ্বারা মাগফিরাত হাসিল হয়)। মু'মিনগণ, আল্লাহ্ যাদের প্রতি রুষ্ট, তোমরা তাদের সাথে (-ও) বন্ধুত্ব করো না। (এখানে ইহুদী জাতিকে বোঝানো হয়েছে, যেমন সূরা মায়িদায় বলা হয়েছে ঃ مَنْ لَعَنَهُ اللّٰهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ)

তারা পরকালের (কল্যাণ ও সওয়াবের) ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেছে ; যেমন কবরস্থ কাফিররা (পরকালের সওয়াব ও কল্যাণ থেকে) নিরাশ হয়ে গেছে। [যে কাফির মারা যায়, সে পরকাল প্রত্যক্ষ করে সেখানকার প্রকৃত অবস্থা নিশ্চিতরূপে জেনে নেয়। সে বুঝতে পারে যে, তাকে কিছুতেই ক্ষমা করা হবে না। ইহুদীরা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নবুয়ত ও নবুয়ত-বিরোধীদের কাফির হওয়ার বিষয়টি খুব জানত ; কিন্তু লজ্জা ও বিদ্বেষের কারণে তাঁর অনুসরণ করত না। কাজেই তারাও মনেপ্রাণে বিশ্বাস করত যে, তারা পরকালে মুক্তি পাবে না। অতএব তাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখা মোটেই জরুরী নয়। মদীনায় ইহুদীদের সংখ্যা বেশী ছিল এবং তারা দুষ্টও ছিল খুব বেশী। তাই এখানে বিশেষভাবে তাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে]।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তির কতিপয় শর্ত বিশ্লেষণ ঃ সূরা ফাত্হ-তে হুদায়বিয়ার ঘটনা বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। এতে অবশেষে মক্কার কাফির ও রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মধ্যে একটি দশ বছর মেয়াদী শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির কতিপয় শর্ত এমন ছিল যে, এতে কাফিরদের কাছে মুসলমানদের মাথা নত করা ও বাহ্যিক পরাজয় মেনে নেওয়ার ভাব পরিস্ফুট ছিল। এ কারণেই সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে এ ব্যাপারে একটা চাপা অসন্তোষ ও ক্ষোভের ভাব দেখা দিয়েছিল। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহ্র ইঙ্গিতে অনুভব করছিলেন যে, এই ক্ষণস্থায়ী পরাজয় অবশেষে চিরস্থায়ী প্রকাশ্য বিজয়েরই পূর্বাভাস হবে। তাই তিনি শর্তগুলো মেনে নেন এবং সাহাবায়ে কিরামও অতঃপর আর উচ্চবাচ্য করেন নি।

এই শান্তিচুক্তির অন্যতম শর্ত ছিল এই যে, মক্কা থেকে কোন ব্যক্তি মদীনায় চলে গেলে রসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে ফেরত পাঠিয়ে দেবেন যদিও সে মুসলমান হয়। কিন্তু মদীনা থেকে কেউ মক্কায় চলে গেলে কোরাইশরা তাকে ফেরত পাঠাবে না। এই শর্তের ভাষা ছিল ব্যাপক, যাতে পুরুষ ও নারী উভয়ই বাহ্যত অন্তর্ভুক্ত ছিল। অর্থাৎ কোন মুসলমান পুরুষ অথবা নারী মক্কা থেকে চলে গেলে রসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে ফেরত পাঠাবেন।

এই চুক্তি সম্পাদন শেষে রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন হুদায়বিয়াতেই অবস্থানরত ছিলেন, তখন মুসলমানদের জন্য অগ্নিপরীক্ষাতুল্য একাধিক ঘটনা সংঘটিত হয়ে যায়। তন্মধ্যে একটি ঘটনা হযরত আবূ জন্দল (রা)-এর। কোরাইশরা তাঁকে কারারুদ্ধ করে রেখেছিল। তিনি কোন রকমে সেখান থেকে পালিয়ে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে উপস্থিত হলেন। তাঁকে দেখে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে ভীষণ উদ্বেগ দেখা দিল যে, চুক্তির শর্তানুযায়ী তাঁকে ফেরত পাঠানো উচিত, কিন্তু আমরা আমাদের একজন নির্যাতিত ভাইকে জালিমদের হাতে পুনরায় তুলে দেব—এটা কিরূপে সম্ভব ?

কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা) চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলেন। তিনি শরীয়তের নীতিমালার হিফাযত ও তৎপ্রতি দৃঢ়তা এক ব্যক্তির কারণে বিসর্জন দিতে পারতেন না। এর সাথে সাথে তাঁর দূরদর্শী অন্তর্দৃষ্টি সত্বরই এই নির্যাতিতদের বিজয়ীসুলভ মুক্তিও যেন প্রত্যক্ষ করে যাচ্ছিল। স্বভাবগত কারণেই তিনিও আবূ জন্দল (রা)-কে ফেরত প্রত্যর্পণে দুঃখিত হয়ে থাকবেন, কিন্তু চুক্তি পালনের খাতিরে তাঁকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে বিদায় করে দিলেন।

এর সাথে সাথেই দ্বিতীয় একটি ঘটনা সংঘটিত হল। মুসলমান সাঈদা বিনতে হারেস (রা) কাফির সায়ফী ইবনে আনসারের পত্নী ছিলেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে সায়ফীর নাম মুসাফির মখযুমী বলা হয়েছে। তখন পর্যন্ত মুসলমান ও কাফিরের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন হারাম ছিল না। এই মুসলমান মহিলা মক্কা থেকে পালিয়ে হুদায়-বিয়ায় রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে উপস্থিত হলেন। সাথে সাথে স্বামীও হাযির। সে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে দাবী জানাল যে, আমার স্ত্রীকে আমার কাছে প্রত্যর্পণ করা হোক। কেননা, আপনি এই শর্ত মেনে নিয়েছেন এবং চুক্তিপত্রের কালি এখনও শুকায়নি।

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে। এসব আয়াতে প্রকৃতপক্ষে মুসলমান ও কাফিরদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক নিষিদ্ধ ও হারাম করা হয়েছে। এর পরিণতিতে এ কথাও প্রমাণিত হয় যে, কোন মুসলমান নারী হিজরত করে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে পৌঁছে গেলে তাকে কাফিরদের হাতে ফেরত দেওয়া হবে না---সে পূর্ব থেকেই মুসলমান হোক ; যেমন উল্লিখিত সাঈদা অথবা হিজরতের সময় তার মুসলমানিত্ব প্রমাণিত হোক। তাকে ফেরত না দেওয়ার কারণ এই যে, সে তার কাফির স্বামীর জন্য হালাল নয়। তফসীরে কুরতুবীতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে এই ঘটনা বর্ণিত রয়েছে।

মোট কথা, উল্লিখিত আয়াতসমূহ অবতরণের ফলে এ কথা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, চুক্তিপত্রের উপরোক্ত শর্তটি ব্যাপক অর্থে প্রযোজ্য নয় যে, পুরুষ অথবা নারী যে কোন মুসলমান আগমন করুক, তাকে ফেরত দিতে হবে। বরং এই শর্তটি ব্যাপক, কেবল পুরুষ-দের ক্ষেত্রে গ্রহণীয়---নারীদের ক্ষেত্রে নয়। নারীদের ব্যাপারে শুধু এতটুকু বলা যায় যে, যে নারী মুসলমান হয়ে হিজরত করে, তার কাফির স্বামী মোহরানার আকারে যা কিছু তার পেছনে ব্যয় করেছে, তা তাকে ফেরত দেওয়া হবে। এসব আয়াতের ভিত্তিতে রসূলুল্লাহ্ (সা) চুক্তিপত্রে উল্লিখিত এই শর্তের সঠিক মর্ম ব্যাখ্যা করেন এবং তদনুযায়ী সাঈদা (রা)-কে কাফিরদের কাছে ফেরত প্রেরণে বিরত থাকেন।

কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, উম্মে কুলসুম বিনতে ওতবা মক্কা থেকে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে উপস্থিত হয়। তার পরিবারের লোকেরা শর্তের ভিত্তিতে তাকে ফেরত দানের দাবী জানায়। এর পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতসমূহ নাযিল হয়। অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে, উম্মে কুলসুম আমর ইবনে আস (রা)-এর স্ত্রী ছিলেন। স্বামী তখনও মুসলমান ছিল না। উম্মে কুলসুম ও তাঁর দুই ভাই মক্কা থেকে পলায়ন করে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে চলে যান। সাথে সাথেই তাঁদেরকে ফেরত পাঠানোর দাবী উঠে। রসূলুল্লাহ্ (সা) শর্ত অনুযায়ী আম্মারা ও ওলীদ ভ্রাতৃদ্বয়কে ফেরত পাঠিয়ে দেন ; কিন্তু উম্মে কুলসুমকে ফেরত দেন নি। তিনি বললেন ঃ এই শর্ত পুরুষদের জন্য, নারীদের জন্য নয়। এর পরি-প্রেক্ষিতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সত্যায়নে আলোচ্য আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়।

এমনি ধরনের আরও কয়েকজন নারীর ঘটনা রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে। বলা বাহুল্য, এগুলোর মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। সবগুলো ঘটনাই সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

উল্লিখিত শর্ত থেকে নারীদের ব্যতিক্রম চুক্তি ভঙ্গের শামিল নয়; বরং উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে একটি শর্তের ব্যাখ্যা মাত্র ঃ কুরতুবীর উল্লিখিত রেওয়ায়েত থেকে জানা গেল যে, চুক্তির উপরোক্ত ধারার ভাষা যদিও ব্যাপক ছিল, কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মতে তাতে নারীরা শামিল ছিল না। তাই তিনি হুদায়বিয়াতেই বিষয়টি ব্যাখ্যা করে দেন এবং এরই সত্যায়নে আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়।

কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) শর্তটিকে ব্যাপক ভিত্তিতেই মেনে নিয়েছিলেন এবং তাতে নারীরাও শামিল ছিল। কিন্তু আলোচ্য আয়াত-সমূহ অবতরণের ফলে ব্যাপকতা রহিত হয়ে যায় এবং রসূলুল্লাহ্ (সা) তখনই কাফির-দেরকে অবহিত করে দেন যে, মহিলারা এই শর্তের অন্তর্ভুক্ত নয়। সেমতে তিনি কোন নারীকে ফেরত পাঠান নি। এ থেকে বোঝা গেল যে, এটা চুক্তির বরখেলাফ কাজ ছিল না এবং চুক্তি খতম করে দেওয়াও ছিল না; বরং একটি শর্তের ব্যাখ্যা ছিল মাত্র। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র উদ্দেশ্য পূর্ব থেকেই এরূপ ছিল কিংবা আয়াত নাযিল হওয়ার পর তিনি শর্ত-টিকে পুরুষদের ক্ষেত্রে সীমিত রাখার জন্য প্রতিপক্ষকে বলে দিয়েছিলেন। সর্বাবস্থায় এই ব্যাখ্যার পরও চুক্তিপত্রটি উভয় পক্ষ বহাল রাখে এবং দীর্ঘদিন পর্যন্ত তা বাস্তব রূপ লাভ করতে থাকে। এই শান্তিচুক্তির ফলশ্রুতিতেই রাস্তাঘাট বিপদমুক্ত হয় এবং রসূলুল্লাহ্ (সা) বিশ্বের রাজন্যবর্গের নামে পত্র লিখেন। এরই সুবাদে আবূ সুফিয়ানের কাফিলা নিশ্চিন্তে সিরিয়া পর্যন্ত পৌঁছে। সেখানে সম্রাট হিরাক্লিয়াস তাকে রাজদরবারে ডেকে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র অবস্থাদি জিজ্ঞাসা করেন।

সারকথা এই যে, এই শর্তের ভাষা ছিল ব্যাপক। নারীরা এর অন্তর্ভুক্ত না থাকার বিষয়টি পূর্ব থেকেই রসূলুল্লাহ্ (সা)-র দৃষ্টিতে ছিল কিংবা আয়াত নাযিল হওয়ার পর তিনি নারীদেরকে শর্ত থেকে খারিজ করে দেন। উভয় অবস্থাতেই কাফির ও মুসলমান-দের মধ্যে এই চুক্তি এরপরও পূর্ণাঙ্গরূপে বলবৎ ছিল এবং দীর্ঘদিন পর্যন্ত তা পালিত হয়। কাজেই এই ব্যাখ্যাকে চুক্তিভঙ্গকরণ অথবা চুক্তি খতমকরণরূপে গণ্য করা যায় না। অতঃপর ভাষাদৃষ্টে আয়াতসমূহের অর্থ অনুধাবন করুন।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ

أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ — আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, নারীদের মুসলমান ও মু'মিন হওয়াই সন্ধির শর্ত থেকে তাদের ব্যতিক্রমভুক্ত হওয়ার কারণ। মক্কা থেকে মদীনায় আগমন-কারিণী নারীদের ক্ষেত্রে এরূপ সম্ভাবনাও ছিল যে, তাদের কেউ ইসলাম ও ঈমানের খাতিরে নয়, বরং স্বামীর সাথে ঝগড়া করে অথবা মদীনার কোন ব্যক্তির প্রেমে পড়ে অন্য কোন পার্থিব স্বার্থের কারণে হিজরত করেছে। এরূপ নারী আল্লাহ্র কাছে এই শর্তের ব্যতিক্রম-ভুক্ত নয়; বরং সন্ধির শর্ত অনুযায়ী তাকে ফেরত পাঠানো জরুরী। তাই মুসলমান-গণকে আদেশ করা হয়েছে যে, যেসব নারী হিজরত করে মদীনায় আসে, তাদের ঈমান

পরীক্ষা করে নাও। এর সাথেই বলা হয়েছে ঃ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِهِنَّ এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সত্যিকার ও আসল ঈমানের সম্পর্ক তো অন্তরের সাথে, যার খবর আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ জানতে পারে না। তবে মৌখিক স্বীকারোক্তি ও লক্ষণাদি দৃষ্টে ঈমান সম্পর্কে অনুমান করা যায়। সুতরাং মুসলমানগণকে এ বিষয়েরই আদেশ দেওয়া হয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) পরীক্ষার পদ্ধতি সম্পর্কে বলেন ঃ মুহাজির নারীকে শপথ করানো হত যে, সে স্বামীর প্রতি বিদ্বেষ ও ঘৃণার কারণে আগমন করেনি, মদীনার কোন ব্যক্তির প্রেমে পড়ে আসেনি এবং অন্য কোন পার্থিব স্বার্থের বশবর্তী হয়ে হিজরত করেনি বরং একান্তভাবে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের ভালবাসা ও সন্তুষ্টিলাভের জন্য আগমন করেছে। যে নারী এই শপথ করত, রসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে মদীনায় বসবাসের অনুমতি দিতেন এবং সে তার স্বামীর কাছ থেকে যে মোহরানা ইত্যাদি আদায় করেছিল, তা তার স্বামীকে ফেরত দিয়ে দিতেন।---(কুরতুবী)

তিরমিযীতে হযরত আয়েশা (রা)-র রেওয়ায়েতক্রমে বলা হয়েছে ঃ নারীদের পরীক্ষার পদ্ধতি ছিল সেই আনুগত্যের শপথ, যা পরবর্তী আয়াতসমূহে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে অর্থাৎ اِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ — মুহাজির নারীরা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র হাতে আয়াতে বর্ণিত বিষয়সমূহের শপথ করত। এটাও অসম্ভব নয় যে, প্রথমে তাদেরকে সেসব বাক্যও উচ্চারণ করানো হত, যেগুলো হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর রেওয়ায়েতে উল্লিখিত হয়েছে। এরপর আয়াতে বর্ণিত শপথ দ্বারা তা পূর্ণ করা হত।

فَاِنْ عَلِمْتُمُوْهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوْهُنَّ اِلَى الْكُفَّارِ — অর্থাৎ পরীক্ষার পর যদি তারা মু'মিন প্রতিপন্ন হয়, তবে তাদেরকে কাফিরদের কাছে ফেরত পাঠানো বৈধ নয়।

لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّوْنَ لَهُنَّ — অর্থাৎ এই নারীরা কাফির পুরুষদের জন্য হালাল নয় এবং কাফির পুরুষরা তাদের জন্য হালাল নয় যে, তাদেরকে পুনর্বিবাহ করবে।

এই আয়াত ব্যক্ত করেছে যে, যে নারী কোন কাফিরের বিবাহাধীনে ছিল, এরপর সে মুসলমান হয়ে গেছে, তার বিবাহ কাফিরের সাথে আপনা-আপনি ভঙ্গ হয়ে গেছে, তারা একে অপরের জন্য হারাম। নারীদেরকে সন্ধির শর্ত থেকে ব্যতিক্রমভুক্ত রাখার কারণ এটাই।

وَاٰتُوْهُمْ مَّا اَنْفَقُوْا — অর্থাৎ মুহাজির মুসলমান নারীর কাফির স্বামী বিবাহে

মোহরানা ইত্যাদি বাবদ যা ব্যয় করেছে, তা সবই তার স্বামীকে ফেরত দাও। কেননা, নারীকে ফেরত দেওয়াই কেবল সন্ধি-শর্তের ব্যতিক্রমভুক্ত ছিল, যা হারাম হওয়ার কারণে সম্ভবপর নয়, কিন্তু স্বামীর প্রদত্ত ধনসম্পদ শর্ত অনুযায়ী ফেরত দেওয়া উচিত। মুহাজির নারীকে সরাসরি এই ধনসম্পদ ফেরত দিতে বলা হয়নি বরং সাধারণ মুসলমানদেরকে বলা হয়েছে যে, তোমরা ফেরত দাও। কারণ, স্বামী প্রদত্ত ধনসম্পদ খতম হয়ে যাওয়ার আশংকাই প্রবল। ফলে নারীদের কাছ থেকে ফেরত দেওয়ানো সম্ভবপর নয় বিধায় বিষয়টি সাধারণ মুসলমানদের দায়িত্বে দেওয়া হয়েছে। যদি বায়তুলমাল থেকে দেওয়া সম্ভবপর হয়, তবে সেখান থেকে নতুবা মুসলমানদের কাছ থেকে চাঁদা তুলে দেওয়া হবে।—(কুরতুবী)

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ—পূর্বের আয়াত থেকে বোঝা গেছে যে, মুহাজির মুসলমান নারীর বিবাহ তার কাফির স্বামীর সাথে ভঙ্গ হয়ে গেছে। এই আয়াতে তারই পরিশিষ্ট বর্ণনা করা হয়েছে যে, এখন মুসলমান পুরুষের সাথে তার বিবাহ হতে পারে; যদিও প্রাক্তন কাফির স্বামী জীবিত থাকে এবং তালাকও না দেয়।

কাফির পুরুষের স্ত্রী মুসলমান হয়ে গেলে তাদের পারস্পরিক বিবাহ বন্ধন যে ছিন্ন হয়ে যায়, এ কথা পূর্বের আয়াত থেকে জানা গেছে। কিন্তু অন্য একজন মুসলমানের সাথে তার বিবাহ কখন জায়েয হবে, এ সম্পর্কে ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) বলেন ঃ আসল বিধি এই যে, যে কাফির পুরুষের স্ত্রী মুসলমান হয়, ইসলামী বিচারক তাকে ডেকে বলবে ঃ যদি তুমিও মুসলমান হয়ে যাও, তবে তোমাদের বিবাহ বহাল থাকবে নতুবা ভঙ্গ হয়ে যাবে। এরপরও যদি সে ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করে, তবে তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ সম্পন্ন হয়ে যাবে। তখন মুসলমান নারী কোন মুসলমান পুরুষকে বিবাহ করতে পারে। বলা বাহুল্য, ইসলামী রাষ্ট্রেই ইসলামী বিচারক কাফির স্বামীকে আদালতে হাযির করতে পারে। কাফির দেশে কিংবা শত্রুদেশে এরূপ ঘটনা ঘটলে সেখানে স্বামীকে ইস-লাম গ্রহণ করতে বলা সম্ভবপর নয়। ফলে বিবাহ বিচ্ছেদের ফয়সালা হতে পারবে না। তাই এমতাবস্থায় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ তখন সম্পন্ন হবে, যখন মুসলমান নারী হিজরত করে দারুল ইসলামে চলে আসে অথবা মুসলমানদের সেনা ছাউনিতে চলে আসে। উপরোক্ত ঘটনাবলীতে দারুল ইসলামের আসা মদীনায় পৌঁছার মাধ্যমে হতে পারে এবং সেনা ছাউনীতে আসা হুদায়বিয়ায় পৌঁছার মাধ্যমে হতে পারে। কারণ, তখন হুদায়-বিয়ায় মুসলিম বাহিনী অবস্থানরত ছিল। ফিকাহ্‌বিদগণের পরিভাষায় একে 'ইখতিলাফে-দারাইন' বলা হয়েছে অর্থাৎ যখন কাফির পুরুষ ও তার মুসলমান স্ত্রীর মধ্যে দুই দেশের ব্যবধান হয়ে যায়—একজন কাফির দেশে ও অন্যজন মুসলিম দেশে থাকে, তখন তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ সম্পন্ন হয়ে যায়। ফলে নারী অপরকে বিবাহ করার জন্য মুক্ত হয়ে যায়। —(হিদায়া)

আলোচ্য আয়াতে إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ বাক্যটি শর্তরূপে উল্লিখিত

হয়েছে অর্থাৎ তোমরা এই নারীদেরকে মোহরানা দিয়ে দেওয়ার শর্তে বিবাহ করতে পার। এটা প্রকৃতপক্ষে বিবাহের শর্ত নয়। কেননা, সবার মতেই বিবাহ মোহরানা আদায় করার উপর নির্ভরশীল নয়, তবে বিবাহের কারণে মোহরানা আদায় করা ওয়াজিব অবশ্যই। এখানে একে শর্তরূপে উল্লেখ করার কারণ সম্ভবত এই যে, এই মাত্র এক মোহরানা কাফির স্বামীকে ফেরত দেওয়ানো হয়েছে। কাজেই বিবাহকারী মুসলমান মনে করতে পারে যে, নতুন মোহরানা দেওয়ার আর আবশ্যকতা নেই। এই ভ্রান্তি দূর করার জন্য বলা হয়েছে যে, বিগত মোহরানার সম্পর্ক বিগত বিবাহের সাথে ছিল। এটা নতুন বিবাহ ; কাজেই এর জন্য নতুন মোহরানা অপরিহার্য।

وَلَا تُمْسِكُوْا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ—عصم শব্দটি عصمة-এর বহুবচন। এর আসল অর্থ সংরক্ষণ ও সংহতি। এখানে বিবাহ বন্ধন ইত্যাদি সংরক্ষণ যোগ্য বিষয় বোঝানো হয়েছে।

كوافر শব্দটি كافرة-এর বহুবচন। এখানে মুশরিক রমণী বোঝানো হয়েছে। কেননা, কিতাবী কাফির রমণীকে বিবাহ করা কোরআনে সিদ্ধ রাখা হয়েছে। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, এ পর্যন্ত মুসলমান ও মুশরিকদের মধ্যে যে বৈবাহিক সম্পর্ক বৈধ ছিল, তা খতম করে দেওয়া হল। এখন কোন মুসলমানের বিবাহ মুশরিক নারীর সাথে বৈধ নয়। পূর্বে যে বিবাহ হয়েছে, তাও খতম হয়ে গেছে। এখন কোন মুশরিক নারীকে বিবাহে আবদ্ধ রাখা হালাল নয়।

এই আয়াত নাযিল হওয়ার সময় যে সাহাবীর বিবাহে কোন মুশরিক নারী ছিল, তিনি তাকে ছেড়ে দেন। হযরত উমর ফারূক (রা)-এর বিবাহে দুইজন মুশরিক নারী ছিল। হিজরতের সময় তারা মক্কায় থেকে গিয়েছিল। এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর তিনি তাদেরকে তালাক দিয়ে দেন।---(মাযহারী) এখানে তালাকের অর্থ সম্পর্কচ্ছেদ করা। পারিভাষিক তালাকের এখানে প্রয়োজনই নেই। কেননা, আয়াতবলেই তাদের বিবাহ ভঙ্গ হয়ে যায়।

وَاسْئَلُوْا مَا اَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْئَلُوْا مَا اَنْفَقُوْا----অর্থাৎ যখন মুসলমান নারীকে মক্কায় ফেরত পাঠানো হবে না এবং তার মোহরানা স্বামীকে ফেরত দেওয়া হবে, এমনিভাবে যদি কোন মুসলমান নারী ধর্মত্যাগী হয়ে মক্কায় চলে যায় অথবা পূর্ব থেকেই কাফির থাকার কারণে মুসলমান স্বামীর হাতছাড়া হয়ে যায় এবং মুসলমান স্বামীকে তার মোহরানা ফেরত দেওয়া কাফিরদের দায়িত্ব হয়, তখন পারস্পরিক সমঝোতা ও বোঝাপড়ার মাধ্যমে এসব লেনদেনের মীমাংসা করে নেওয়া কর্তব্য। উভয় পক্ষ যে মোহরানা ইত্যাদি দিয়েছে তা জিজ্ঞাসা করে জেনে নিয়ে তদনুযায়ী লেনদেন করে নেওয়া উচিত।

এই আদেশ মুসলমানগণ সানন্দে পালন করেছে। কারণ, কোরআনের আদেশ পালন করা তাদের কাছে ফরয। কাজেই যে যে নারী হিজরত করে এসেছিল, তাদের সবার মোহরানা ইত্যাদি কাফির স্বামীদের কাছে ফেরত পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু মক্কার

কাফিররা কোরআনে বিশ্বাস না থাকার কারণে এই আদেশ পালন করেনি। এর পরিপ্রেক্ষিতে পবরর্তী আয়াত অবতীর্ণ হয়।

وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ الاية — عاقبتم

শব্দটি معاقبة থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ প্রতিশোধ নেওয়াও হয়ে থাকে। এখানে এই অর্থও হতে পারে।---(কুরতুবী) আয়াতের উদ্দেশ্য এই হবে যে, মুসলমানদের কিছু সংখ্যক স্ত্রীলোক যদি কাফিরদের হাতে থেকে যায়, তবে তাদের মুসলমান স্বামীদেরকে মোহরানা ইত্যাদি ফেরত দেওয়া কাফিরদের জন্য জরুরী ছিল, যেমন, মুসলমানদের পক্ষ থেকে মুহাজির নারীদের কাফির স্বামীদেরকে মোহরানা ফেরত দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কাফিররা এরূপ করল না এবং মুসলমান স্বামীদেরকে মোহরানা ফেরত দিল না। এখন তোমরা যদি এর প্রতিশোধ নাও এবং কাফিরদের প্রাপ্য মোহরানা তোমাদের প্রাপ্য পরিমাণে আটক কর, তবে এর বিধান এই যে, فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا

অর্থাৎ তোমরা মুহাজির নারীদের দেয় আটককৃত মোহরানা থেকে সেই মুসলমান স্বামীদেরকে তাদের ব্যয়কৃত অর্থের পরিমাণে দিয়ে দাও, যাদের স্ত্রী কাফিরদের হাতে রয়ে গেছে।

عاقبتم-এর অপর অর্থ যুদ্ধে সম্পদ হাসিল করাও হয়ে থাকে। তখন আয়াতের অর্থ হবে এই যে, যেসব মুসলমানের স্ত্রী কাফিরদের হাতে চলে গেছে এবং শর্ত অনুযায়ী কাফিররা মুসলমান স্বামীদেরকে মোহরানা দেয়নি, এরপর মুসলমানেরা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ লাভ করেছে, এই যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকেই মুসলমান স্বামীদের প্রাপ্য দিতে হবে।---(কুরতুবী)

কিছু মুসলমান নারী ধর্মত্যাগ করে মক্কায় চলে গিয়েছিল কি? এই আয়াতে যে ব্যাপারে বিধান বর্ণনা করা হয়েছে, তার ঘটনা কারও কারও মতে মাত্র একটিই সংঘটিত হয়েছিল। তা এই যে, হযরত আয়ায ইবনে গানাম কোরায়শীর স্ত্রী উম্মুল হাকাম বিনতে আবূ সুফিয়ান ইসলাম ত্যাগ করে মক্কায় চলে গিয়েছিল। অবশ্য পরবর্তী সময়ে সে ফিরে এসেছিল।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এছাড়া আরও পাঁচজন নারীর কথা উল্লেখ করেছেন, যারা হিজরতের সময়েই মক্কায় কাফিরদের সাথে থেকে গিয়েছিল এবং পূর্ব থেকেই কাফির ছিল। কোরআনের এই আয়াত নাযিল হওয়ার ফলে যখন মুসলমান পুরুষ ও কাফির নারীর বিবাহ ভঙ্গ হয়ে যায়, তখনও তারা ইসলাম গ্রহণ করতে সম্মত হয়নি। ফলে তারাও সেই নারীদের মধ্যে গণ্য হয়, যাদের মোহরানা কাফিরদের কাছে মুসলমান স্বামীদের প্রাপ্য ছিল। কাফিররা যখন এই প্রাপ্য পরিশোধ করল না, তখন রসূলুল্লাহ্ (সা) যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকে পরিশোধ করে দিলেন।

এ থেকে জানা গেল যে, ধর্ম ত্যাগ করে মদীনা থেকে মক্কায় চলে যাওয়ার ঘটনা মাত্র একটিই ছিল। অবশিষ্ট পাঁচজন নারী পূর্ব থেকেই কাফির ছিল এবং কাফির থাকার কারণে আয়াতের ভিত্তিতে মুসলমানদের সাথে তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গিয়েছিল। যে নারী ধর্ম ত্যাগ করে মক্কায় চলে গিয়েছিল, সেও পরবর্তীকালে মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। ---(কুরতুবী) বগভী (র) বর্ণনা করেন যে, অবশিষ্ট পাঁচজনও পরে ইসলাম গ্রহণ করে নিয়েছিল।---(মাযহারী)

নারীদের আনুগত্যের শপথঃ يٰٓاَيُّهَا النَّبِىُّ اِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنٰتُ

يُبَايِعْنَكَ -এ আয়াতে মুসলমান নারীদের কাছ থেকে একটি বিস্তারিত আনুগত্যের শপথ নেওয়ার বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। এতে ঈমান ও আকায়িদসহ শরীয়তের বিধি-বিধান পালন করারও অঙ্গীকার রয়েছে। পূর্ববর্তী আয়াত দৃষ্টে যদিও এই শপথ মুহাজির নারীদের ঈমান পরীক্ষার পরিশিষ্ট হিসাবে বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু ভাষার ব্যাপকতার কারণে এটা শুধু তাদের বেলায়ই প্রযোজ্য নয়। বরং সব মুসলমান নারীর জন্য ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য। বাস্তব ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে শুধু মুহাজির নারীরাই নয়, -অন্যান্য নারীরাও শপথ করেছে। সহীহ্ বুখারীর রেওয়ায়েতে হযরত ওমায়মা বর্ণনা করেনঃ আমি আরও কয়েকজন মহিলাসহ রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে শপথ করেছি। তিনি আমাদের কাছ থেকে শরীয়তের বিধি-বিধান পালনের অঙ্গীকার নে এবং সাথে সাথে এই বাক্যও উচ্চারণ করান فيما استطعتن و اطقتن. অর্থাৎ আমরা এসব বিষয় পালনের অঙ্গীকার করি যে পর্যন্ত আমাদের সাধ্যে কুলায়। ওমায়মা এরপর বলেনঃ এ থেকে জানা গেল যে, আমাদের প্রতি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র স্নেহ মমতা আমাদের নিজেদের চাইতেও বেশী ছিল। আমরা তো নিঃশর্ত অঙ্গীকারই করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তিনি আমাদেরকে শর্তযুক্ত অঙ্গীকার শিক্ষা দিলেন। ফলে অপারগ অবস্থায় বিরুদ্ধাচরণ হয়ে গেলে তা অঙ্গীকার ভঙ্গের শামিল হবে না।---(মাযহারী)

সহীহ্ বুখারীতে হযরত আয়েশা (রা) এই শপথ সম্পর্কে বলেনঃ মহিলাদের এই শপথ কেবল কথাবার্তার মাধ্যমে হয়েছে ---হাতের উপর হাত রেখে শপথ হয়নি, যা পুরুষদের ক্ষেত্রে হত। বস্তুত রসূলুল্লাহ্ (সা)-র হাত কখনও কোন গায়র মাহ্রাম নারীর হাতকে স্পর্শ করেনি।---(মাযহারী)

হাদীস থেকে প্রমাণিত আছে যে, এই শপথ কেবল হুদায়বিয়ার ঘটনার পরেই নয় বরং বারবার হয়েছে। এমনকি, মক্কা বিজয়ের দিনও রসূলুল্লাহ্ (সা) পুরুষদের কাছ থেকে শপথ গ্রহণ সমাপ্ত করে সাফা পর্বতের উপর নারীদের কাছ থেকে শপথ গ্রহণ করেন। পর্বতের পাদদেশে দাঁড়িয়ে হযরত উমর (রা) রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বাক্যাবলী নিচে সমবেত মহিলাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিতেন।

তখন যারা আনুগত্যের শপথ করেছিল, তাদের মধ্যে আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দাও ছিল। সে প্রথমে লজ্জাবশত নিজেকে গোপন রাখতে চেয়েছিল, এরপর শপথের কিছু বিবরণ জিজ্ঞাসা করে নিতে বাধ্য হয়েছিল। সে একাধিক প্রশ্ন উত্থাপন করেছিল।---(মাযহারী)

পুরুষদের শপথ সংক্ষেপে এবং নারীদের শপথ বিশদরূপে হয়েছে ঃ পুরুষদের কাছ থেকে সাধারণত ইসলাম ও জিহাদের শপথ নেওয়া হয়েছে। এতে কার্যগত বিধি-বিধানের বিশদ বিবরণ ছিল না কিন্তু মহিলাদের শপথে তা ছিল। এই পার্থক্যের কারণ এই যে, পুরুষদের কাছ থেকে ঈমান ও আনুগত্যের শপথ নেওয়ার মধ্যে এসব বিধি-বিধান অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাই বিস্তারিত বিবরণের প্রয়োজন অনুভূত হয়নি। নারীরা সাধারণত বুদ্ধি-বিবেচনায় পুরুষদের অপেক্ষা কম হয়ে থাকে। তাই বিস্তারিত বিবরণ সমীচীন মনে করা হয়েছে এবং নারীদের কাছ থেকে এই শপথ নেওয়ার সূচনা করা হয়েছে। এরপর পুরুষদের কাছ থেকেও এসব বিষয়েরই শপথ নেওয়ার কথা হাদীস থেকে জানা যায়।---(কুরতুবী) এ ছাড়া নারীদের কাছ থেকে যেসব বিধি-বিধান পালনের অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছে, নারীরা সাধারণত এসব বিষয়ে বিচ্যুতির শিকার হয়ে থাকে। এ কারণেও তাদের আনুগত্যের শপথে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ — এতে প্রথম বিষয় হচ্ছে ঈমান অবলম্বন করা এবং শিরক থেকে আত্মরক্ষা করা। এটা সাধারণ পুরুষদের শপথেও থাকে। দ্বিতীয় বিষয় চুরি না করা। অনেক নারীই স্বামীর ধনসম্পদ চুরি করতে অভ্যস্ত হয়ে থাকে। তাই এটা উল্লেখ করা হয়েছে। তৃতীয় বিষয় ব্যভিচার থেকে বেঁচে থাকা। এতে নারীরা পাকাপোক্ত হলে পুরুষদের জন্যও আত্মরক্ষা করা সহজ হয়ে যায়। চতুর্থ বিষয় নিজ সন্তানকে হত্যা না করা।

মূর্খতা যুগে কন্যা সন্তানদেরকে জীবন্ত প্রোথিত করার প্রচলন ছিল। আয়াতে একে রোধ করা হয়েছে। পঞ্চম বিষয় মিথ্যা অপবাদ ও কলংক আরোপ না করা। এই নিষেধাজ্ঞার সাথে এ কথাও আছে যে, بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ — অর্থাৎ নিজের হাত ও পায়ের মাঝখানে যেন অপবাদ আরোপ না করে। এর কারণ এই যে, কিয়ামতের দিন মানুষের হস্তপদই তার ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দিবে। উদ্দেশ্য এই যে, এ ধরনের পাপ কর্ম করার সময় লক্ষ্য রাখা উচিত যে, আমি চারজন সাক্ষীর মাঝখানে এই কাজ করছি। এরা আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে।

এখানে স্বামীর প্রতি অথবা অন্য যে কারও প্রতি অপবাদ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কেননা, কাফিরের প্রতিও মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা হারাম। এমতাবস্থায় স্বামীর প্রতি অপবাদ আরোপ করা আরও বেশী কঠোর গোনাহ্ হবে। স্বামীর প্রতি অপবাদ আরোপের এক প্রকার এই যে, স্ত্রী অন্য কোন ব্যক্তির সন্তানকে স্বামীর সন্তানরূপে প্রকাশ করে এবং তার বংশভুক্ত করে দেয়। আরেক প্রকার এই যে, নাউযুবিল্লাহ্, ব্যভিচারের ফলে যে গর্ভ সঞ্চার হয়, তাকে স্বামীর সন্তান বলে চালিয়ে দেয়।

ষষ্ঠ বিষয় হচ্ছে একটি সাধারণ বিধি। তা এই যে وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ অর্থাৎ তারা ভাল কাজে আপনার আদেশ অমান্য করবে না। রসূলুল্লাহ্ (সা) যে কোন কাজের আদেশ দেবেন, তা ভাল না হয়ে পারে না। এর ব্যতিক্রম নিশ্চিত অসম্ভব। এমতাবস্থায় 'ভাল কাজে' কথাটি যুক্ত করার কারণ কি? এর এক কারণ তো এই যে, মুসলমানরা যেন ভাল করে বুঝে নেয় যে, আল্লাহ্‌র আদেশের বিপরীতে কোন মানুষের আনুগত্য করা জায়েয নয়; এমনকি, সেই মানুষটি যদি রসূলও হন, তবুও নয়। তাই রসূলের আনুগত্যের সাথেও এই শর্তটি যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় কারণ এই যে, এখানে ব্যাপার নারীদের। তারা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কোন আদেশেরই খেলাফ করবে না, এরূপ ব্যাপক আনুগত্যের কারণে শয়তান কারও মনে পথভ্রষ্টতার কুমন্ত্রণা সৃষ্টি করতে পারত। এই পথ বন্ধ করার জন্য শর্তটি যুক্ত করা হয়েছে।